চিত্র-চরিত্র

চিত্র-চরিত্র

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
প্রণীত



বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
গ্রাম—কুলগাছিয়া ; পোঃ—মহিষরেখা ;
জেলা—হাওড়া
১৩৫৬

প্রকাশক—শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি এম. এ., বি. এল.
গ্রাম—কুলগাছিয়া ; পোঃ—মহিষরেখা ;
জেলা—হাওড়া ; বি. এন. আর.

প্রথম সংস্করণ—রথযাত্রা ১৩৫৬
মূল্য ছয় টাকা আট আনা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ.
কে. পি. বসু. প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা—৬

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের
করকমলে

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

এই গ্রন্থরচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের রচনা হইতে সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলের নিকটে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী প্রভৃতি।

এ সব ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ও শিবনাথ শাস্ত্রীর অনেক রচনা আমাকে দিগ্‌দর্শন দিয়াছে।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ, কর্মসচিব শ্রীকানাইলাল সরকার এবং দেশ পত্রিকার কর্মী শ্রীঅদ্বৈতচরণ মল্ল বর্মণ অনেক প্রকার সময়োচিত সাহায্য করাতে আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

সর্বশেষে আমার সকল রচনার প্ররোচনা-দাতা শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে এই রচনাটির জন্যও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিষয়-সূচী

চিত্র-চরিত্র

ভূমিকা

যখন এই চিত্র-চরিত্রগুলি আঁকিতে শুরু করিয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, যেমন খুসী কতকগুলি ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করিব—সেই রকম ইচ্ছাই জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। স্বভাবতঃই তাঁহাদের লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, যাঁহারা হাতের কাছে আছেন। বাঙলা দেশের উনবিংশ শতকের মনীষীদের চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া এলবাম শুরু হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে বাঙলা দেশের উনবিংশ শতকের সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস আর একবার পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে বসিয়া মতের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। যাঁহাদের লইয়া লঘুভাবে পরিহাস করিব ভাবিয়াছিলাম—তাঁহারা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। কলমের লঘুরেখা আপনি কখন গভীর দাগ টানিতে শুরু করিল, উনবিংশ শতকের মাহাত্ম্য একটা মানসিক হিমালয়ের অপরিমেয় আকারে লেখকের মনের উপর বিরাট ছায়া ফেলিল, প্র-না-বি'র লঘু কলম কখন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িল। হিমালয়কে লইয়া আর যাহাই করা যাক, পরিহাস করা চলে না।

ঘটনার টানে স্থির হইয়া গেল যে আমাকে উনবিংশ শতকের বাঙলার মানসিক ইতিহাস লিখিতে হইবে। কাজেই প্র-না-বি'র এলবামের মৌলিক অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হইল। তারপরে বৎসরকাল ধরিয়া যাহা সপ্তাহের পরে সপ্তাহে লিখিত হইয়াছে—তাহা পূর্ব চিন্তার ফল নহে, একপ্রকার অপূর্ব চিন্তা। পাঠকগণকে যাহা দিব ভাবিয়াছিলাম, দিতে পারি নাই ; যাহা দিয়াছি, তাহাতে রচনার গৌরব না থাকুক, বিষয়ের গৌরব আছে—এইটুকু মনে রাখিয়া লেখককে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিবেন—ইহা অত্যাশা নহে।

চিত্র-চরিত্র ধারাবাহিক ইতিহাসও নহে আবার খণ্ড জীবনীও নহে, কোন নামের দ্বারা ইহাকে প্রকাশ করিতে হইলে বলা উচিত—ইহা একটি যুগের জীবনচরিত। মানুষের মতো প্রত্যেক যুগেরও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকে—সেই ব্যক্তিত্ব সেই যুগের মনীষিগণের কর্মে ও জীবনে বিশিষ্ট স্বরূপে প্রকাশ পায়। সেই স্বরূপের ব্যাখ্যাতেই যুগ-জীবনী রচিত হইতে পারে। চিত্র-চরিত্র যুগ-জীবনী রচনার সেই চেষ্টা।

ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিত্বকে একটি শব্দে প্রকাশ করা চলে—Reason. উনবিংশ শতকের ব্যক্তিত্বের প্রতীক Science. বিংশ শতকের ব্যক্তিত্ব এখনো প্রকট হইয়া ওঠে নাই, হয়তো এখনো খুব কাছে আছি বলিয়াই ধরা পড়িতেছে না। খুব সম্ভবত 'অহিংসা'

শব্দটিই শেষ পর্য্যন্ত বিংশ শতকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশক হইয়া উঠিবে। বাঙলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বরূপ কি? সংক্ষেপে বলা চলে—'আত্মোপলব্ধি।' বিশদভাবে ইহাই চিত্র-চরিত্রগুলিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মোপলব্ধিরই অপর নাম 'ভারতোপলব্ধি।' এই ভারতোপলব্ধির লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মনীষিগণ মানুষের সর্ববৃত্তির সমন্বয়সিদ্ধ একটি পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লক্ষ্য ভারত-তীর্থ, পন্থা সর্ববৃত্তির সমন্বয়সিদ্ধি কঠিন পথ। পথ কঠিন হইলে তবেই বহু লোকের চলাচল সম্ভব হয়। জ্ঞানের দ্বারা জানা, হৃদয়ের দ্বারা ভালবাসা এবং ইচ্ছার দ্বারা কর্মসাধনা—এই তিনের সাধনাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের সাধ্য ছিল। এই দুরূহ কাজ কতদূর সফল হইয়াছে—তাহা বিচার করা চলিতে পারে—কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সিদ্ধির সফলতার চেয়ে সাধনার আন্তরিকতাকেই ইতিহাসের বিধাতা অধিকতর সম্মান দিয়া থাকেন। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ অবধি বাঙলা দেশের ইতিহাস—এই সাধনারই ইতিহাস। চিত্র-চরিত্র সেই ইতিহাসের একটি খসড়া।

পাল রাজগণের দূরবর্তী ও অস্পষ্ট যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙলা দেশের ইতিহাসের দুইটি 'শতক যুগ' অতিশয় গৌরবময়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী শত বৎসর আর সদ্যগত উনবিংশ শতক। আবার দুটি যুগের গৌরবের মূল কারণ একই প্রকার। সেকালে নবাগত ইসলামের সঙ্ঘাত আমাদের সমাজে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত সমাজকে যখন উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছিল—তখন চৈতন্যদেব সাধারণের সমক্ষে ভক্তির উদার রাজপথটা খুলিয়া দিলেন। সেকালে ইসলামের সঙ্ঘাতের অনুরূপ একালের খৃষ্টীয় ধর্ম ও পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের প্রভাব। একালের মনীষীরা দেখিলেন, এ দুটি প্রভাব এড়াইবার উপায় নাই, আমরা দূরে থাকিলেও তাহারা অযাচিতভাবে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িবে, পড়িয়াছে—এখন বাঁচিবার একমাত্র উপায় তাহাকে আত্মসাৎ করা। তাঁহারা দেখিলেন সাধারণে ইহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিতেছে না—বরঞ্চ তৎসাৎ হইয়া সর্বনাশের মুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তখন তাঁহারা ভারতমুখী পথগুলি খুলিয়া দিলেন। রামমোহনের জ্ঞানমার্গ, কেশব সেনের ভক্তিমার্গ, পরমহংস দেবের সমন্বয়মার্গ—সমস্তই ভারতমুখী, সমস্তই ভারতোপলব্ধির অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির পন্থা। এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া বাঙলার উনবিংশ শতকের ইতিহাসকে পুনঃ পঠন ও পুনর্লিখন আবশ্যক।

আজকাল উনবিংশ শতকের ব্যক্তি ও কীর্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবার একটা ফ্যাশান দেখা দিয়াছে। যে-লোকের চোখে ঘোলা কাঁচের চশমা—তাহার চোখে জগৎটাই ঘোলা। আমরা দূরবীণকে উল্টা করিয়া চোখে আঁটিয়াছি—তাই সমস্তই ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। দূরবীণ যাহাতে সোজাভাবে ব্যবহৃত হয়—তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, উনবিংশ শতকের মহাপুরুষগণ এতই বিরাট যে, বিনা দূরবীণেও তাঁহারা দৃষ্টিগম্য। কেবল ঘোলা চশমা ও উল্টা দূরবীণ ব্যবহার না করিলেই যথেষ্ট।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, উনবিংশ শতক বাঙলার ইতিহাসের একটি অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় যুগ—যেমনটি অনেককাল আসে নাই এবং আর অনেককাল আসিবারও সম্ভাবনা দেখি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষিগণ বহুকাল পরে নূতন করিয়া ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অতি স্মরণীয় কীর্তি। ইহা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়েও মহত্তর সম্ভাবনায় পূর্ণ। আমেরিকা একটি ভূখণ্ড মাত্র। তাহার আবিষ্কারে পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমানা বাড়িয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কলম্বসের আবিষ্কারের ফলে কোন নূতন জীবনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। ইউরোপের ইতিহাসই আমেরিকার ইতিহাস। আমেরিকা বৃহত্তর ইউরোপ ছাড়া আর কি? কিন্তু 'ভারতবর্ষ' বলিতে যেমন একটি ভৌগোলিক সীমা বুঝায়—তেমনি এবং তাহার চেয়েও বেশি করিয়া একটি জীবনতত্ত্বকে বুঝায়। এ-জীবনতত্ত্ব নূতন নয়। বাঙালী মনীষিগণ ইহাকে লোক সমক্ষে আনিয়া ফেলেন। ইহা তাঁহাদের সৃষ্ট নয় বলিলে তাঁহাদের গৌরব হ্রাস পায় না, আমেরিকাও তো কলম্বাসের সৃষ্ট নয়। বৃটিশশক্তি যখন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে এক রাজ্যপাশে বিধৃত করিতেছিল—তখন এই সব মনীষী কঠিন সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাব-মূর্তিকে আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই ভাব-ভারতবর্ষই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল—ইহাই ছিল তাঁহাদের 'স্বর্গ আমার, আমার দেশ।' বঙ্গ কথাটা তখনো চালু হয় নাই। প্রাদেশিকতার সন্ধান তাঁহারা জানিতেন না—তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি বিবর্জিত ছিলেন। বঙ্গ-চেতনা বা প্রাদেশিক চৈতন্য বাঙলা দেশের পতন কালের লক্ষণ। বাঙালী মনীষীদের চরিত্র অঙ্কন করিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি বঙ্গদেশের জয়গানে ব্যস্ত। আদৌ নয়। আমি তাঁহাদেরই জয়ধ্বনি করিতেছি, যাঁহারা ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষুদ্রতর সত্তাকে স্বীকার করিতেন না—প্রকারান্তরে আমি কি ভারতীয় মনীষিগণেরই জয়গান করিতেছি না? রূপান্তরে আমি কি ভারতবর্ষেরই জয়ধ্বনি করিতেছি না? ভারত-আবিষ্কারক বাঙালী আজ বঙ্গ-সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশও হইতেছে। কিন্তু ইহা তো যুক্তি নয়, অজুহাত মাত্র। আধুনিক বাঙালী যে উনবিংশ শতকের কীর্তিকে বুঝিতে অক্ষম, তার কারণ তাহারা ভারতীয় দৃষ্টির পরিবর্তে সর্ববিষয়ে প্রাদেশিক দৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়াছে—তাহাকেই গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেছে, ভাবিতেছে, বাঙলা দেশই ভারতবর্ষ। প্রদেশ-সর্বস্ব বাঙালী পাঠকের চোখের সম্মুখে ভারত-সর্বস্ব বাঙালী মনীষিগণের ছবি তুলিয়া ধরিবার একটা প্রয়াস—এই চিত্র-চরিত্র গ্রন্থ। 'বন্দে মাতরম্'"—আসলে 'বন্দে ভারতম্' ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঙালী কর্তৃক ভারত-আবিষ্কারের কাহিনী কীর্তন আমার দ্বিতীয় বক্তব্য।

উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষা ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানকৈবল্যের প্রভাবে

গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জ্ঞানকৈবল্যের বাহ্যরূপ ফরাসীবিপ্লব। ফরাসীবিপ্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা Reason—Reason-এর আহ্বায়কগণ, ভল্টেয়ার ও এনসাইক্লোপিডিস্টগণ মূলত জ্ঞানমার্গীয় সাধক। ইঁহাদেরই সাধনা ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের পথে, ইংরেজের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই সময়কার বাঙলা দেশে দুইদল ইংরেজ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিল—একদল কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারি; অন্যদল হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্। প্রথম যুগের মিশনারিগণ আদৌ উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, অপরপক্ষে হেয়ার ও ডিরোজিও সেকালের শিক্ষিত ও শিক্ষালাভেচ্ছুগণের চিত্তে তুমুল তুফান তুলিয়াছিলেন। জ্ঞানমার্গের সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কেরি অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সে তো জ্ঞানমার্গীয় প্রভাব। মনে রাখিতে হইবে যে, মূলে কেরি এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেই আসিয়াছিলেন—কিন্তু কার্য্যত তিনি বাঙলা গদ্য সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিলেন।

প্রধানত হেয়ার ও ডিরোজিওকে অবলম্বন করিয়াই এদেশে জ্ঞানমার্গীয় নাস্তিক্য প্রসারিত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রধান প্রধান ছাত্রগণ সকলেই জ্ঞান-কৈবল্যের সাধক—এবং অনেকেই নাস্তিক ছিলেন। অবশ্য ইঁহাদের ছাত্রদের অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা ধর্মানুরক্তির ফল নহে। গুরুদ্বয়ের শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, হিন্দুধর্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই শূন্য চিত্তমন্দিরে তাঁহারা, হেয়ার-ডিরোজিওর ছাত্রগণ Reason-কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু Reason নিজেও একটি শূন্যতা, তাহাতে বেদীপূরণ হয় না, সেই শূন্যপ্রায় বেদীর উপরে তাঁহারা অনেকে খৃষ্টধর্মকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা আদৌ অত্যাশ্চর্য্য নয়। ফরাসী বিপ্লবান্তে Reason-এর মন্দির ফরাসী দেশে খৃষ্টধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারই অনুরূপ, ক্ষুদ্রতর একটা কাণ্ড এদেশের তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিতদের চিত্তে ঘটিয়া গিয়াছিল।

হেয়ার-ডিরোজিওর ছাত্রগণ জ্ঞানকৈবল্যের অতীত কিছু মানিতেন না, তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, জ্ঞান শক্তিস্বরূপ—'নলেজ ইজ পাওয়ার'। নবলব্ধ অস্ত্রখানার মতো সদ্যলব্ধ জ্ঞানকে কেবল আঘাত করিবার কাজেই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানকৈবল্য বা Reason-এর বিপদ এই যে, তাহার পরিণাম উৎকট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা 'ইনডিভিজুয়ালিজম্'। করুণায় ও সমবেদনায় মানুষে মানুষে মিল, বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদ। সেই যুগের এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধাক্কা সমস্ত উনবিংশ শতকের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহার সুফল ও কুফল দুই-ই আমরা ভোগ করিতেছি। পরবর্তী উনবিংশ শতক আর খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করে নাই; নিছক জ্ঞানকৈবল্যকেও তেমন করিয়া স্বীকার করে নাই—কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নেশাকে সে এড়াইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উনবিংশ শতকের বাঙালীর গৌরবের ও নিষ্ফলতার দুইয়েরই মূলে আছে— প্রচণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বাঙালী একক কাজ করিতে পারে, দল বাঁধিলেই গোলমাল পাকাইয়া ফেলে। যে-কাজ একাকী সম্ভব—

বাঙালী তাহাতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সাহিত্য এককের সাধনা—বাঙালী সাহিত্যিক শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু সাহিত্যের এমন অঙ্গ আছে, যাহাতে অনেকের মিলিত হওয়া আবশ্যক—সেখানেও বাঙালী মিলিতে পারে নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু একাই 'বিশ্বকোষ' রচনা করিয়াছেন, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-রচয়িতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন সহকর্মী ছিল না।

জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে কর্মের ক্ষেত্রে আসিয়া এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতর রূপ ধরিয়াছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একাই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এককের কীর্তি। প্রথম আমলের কন্‌গ্রেসে বাঙালীর অবিসম্বাদী প্রাধান্য ছিল—কিন্তু তখনকার কন্‌গ্রেস একটা বার্ষিক সম্মেলন বই কিছু ছিল না। ইহা ছিল কয়েকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে ধার দিবার শানপাথর। কন্‌গ্রেসে যখন সকলকে ডাক দিবার পালা আসিল, তখন আপনিই ব্যক্তিসর্বস্ব বাঙালীর নেতৃত্ব খসিয়া পড়িল। সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও গান্ধীজী সমষ্টিসাধনার মন্ত্র লইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই আদর্শ উনবিংশ শতকের আদর্শ নয়। বরঞ্চ বলা উচিত দীর্ঘ একশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবর্ষ যে সাধনা করিতেছিল—গান্ধীজীর আদর্শ তাহার বিপরীত। এতদিন ছিল জনগণবর্জিত ভারতবর্ষ—এবার তাহার স্থলে দেখা দিল জনগণের ভারতবর্ষ! ইতিহাসের পেণ্ডুলাম ব্যক্তি-সাধনার দিক হইতে সমষ্টি-সাধনার দিকে ফিরিয়া আসিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাধনার অনুষঙ্গরূপে বাঙলা দেশে দ্রুত একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়িয়া উঠিল। ইহা একাধারে ইংরাজশাসনের কীর্তি ও অপকীর্তি, একাধারে ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠা ও বিনাশের কারণ। মধ্যবিত্ত চাকুরিগতপ্রাণ শ্রেণীর সাহায্যেই ইংরাজ এদেশ শাসন করিয়াছে—অবশেষে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইংরাজশাসনে বীতরাগ হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠার প্রথম ইষ্টকখানা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বৈদেশিক শাসনের বেদীকে শিথিল করিয়া দিল। বাঙালী সন্ত্রাসবাদীগণের সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানমর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা আর পূর্ববৎ নাই, ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে তাহাদের প্রভাব প্রতিদিন কমিতে থাকিবে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লইয়াই বাঙলা দেশের বিশেষ সমস্যা। এ সমস্যা এমন বৃহদাকারে অন্যান্য প্রদেশে নাই। বিহারের সমস্যা, উত্তর বিহারের কৃষক, দক্ষিণ বিহারের শ্রমিক। বাঙালীর বিশিষ্ট সমস্যা কৃষকও নয়, শ্রমিকও নয়, কারণ বাঙলার অধিকাংশ শ্রমিক অবাঙালী, অধিকাংশ কৃষক—হায়, এখন পূর্বপাকিস্থানভুক্ত। বাঙলার বিশিষ্ট সমস্যা লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, নানাগুণে কৃতী, অধুনা অসহায় ও অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইহারাই একদা ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে, বাঙালীর সংস্কৃতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে! এখন ইহারা ক্লান্ত, জীবিকার্জনে অক্ষমপ্রায়। এখন ইহারা 'De-mobilised' সৈন্যের মতো অসহায়ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহাদের ভাবেন অবাঞ্ছিত, সাধারণে ভাবে অতিরিক্ত, আর ইহারা নিজেদের ভাবে অভিশপ্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

সুষ্ঠু সমাধান না ঘটিলে ইহারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবে না, হয়তো সেই অশান্তির ফলে আবার শাসনবেদীর ইট খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবে। ইহাদের প্রত্যেকেরই থলিতে সম্ভাবিত লাল নিশান গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে।

আজ এই যে অবস্থায় আমরা আসিয়া পৌছিয়াছি—ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চরমরূপ, চরম কুফল। ইহার মূল হেয়ারের পাঠশালায় এবং হিন্দু কলেজের পাঠগৃহে। সেকালে ইংরাজি শিখিলেই চাকুরি জুটিত, লাট সাহেব ডাকিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন ; কেহ বলিত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেহ বলিত বাবার মত জানিয়া জানাইব, আবার কাহাকেও ঢাকায় যাইতে অনুরোধ করিলে বলিত অ-গঙ্গার দেশে মা যাইতে রাজী নহেন। সেকালে চাকুরি-দাতাই উমেদার ছিলেন। একালে ইংরাজি জানা দূরের কথা, ইংলিশ চ্যানেল গিলিয়া খাইলেও চৌকিদারটাও ফিরিয়া তাকায় না। সেকালের সমাধান—একালের সমস্যায় পরিণত। সেকালের জ্ঞান-কৈবল্যের তীক্ষ্ণ তরবারি একালের কর্মহীন বাঙালীর হাতে পড়িয়া কেবলি চুল চিরিবার চেষ্টা করিয়া দলে দলে 'অমিত রায়ের' সৃষ্টি করিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া দেশব্যাপী উচাটনের সম্মুখে একটা পথ দেখাইলেন বটে—কিন্তু অক্ষয় দত্তের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মকে বেদের বেদী হইতে নামাইয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্রোতকেই সাহায্য করিলেন। ধর্মে আত্ম-প্রত্যয় সত্য হইলে কে কাহার কথা মানিবে? কাহার মত সত্য বুঝিব ; সকলেই যে স্ব স্ব প্রধান হইয়া দাঁড়ায়? আমি যাহা বুঝি করি, তুমি যাহা বোঝো করো, সে যাহা বোঝে করে—কিন্তু এই সব বোঝার সঙ্গতি কোথায়? বেদকে আমিও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বলি না—কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ একটা কিছু থাকা দরকার—নতুবা কাজ চলাই যে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নিজ নিজ আত্মপ্রত্যয় অনুসারে কাজ করিতে থাকিলে কাজ চলে কিনা জানি না—কিন্তু সমাজ অচল হইয়া পড়ে। কিম্বা সমাজের নামে যে বস্তু টিঁকিয়া থাকে তাহা ব্যক্তিসর্বস্ব ব্যক্তিসমূহের একটা সমষ্টিমাত্র। সমষ্টি মাত্রেই সমাজ নহে। পরস্পরের মধ্যে অনিবার্য্য অপরিহার্য্য যোগের ফলেই সমাজ গড়িয়া ওঠে। আত্মপ্রত্যয়কে মুখ্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সেই যোগসূত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমার নিজের ধারণা এই পরিবর্তনে দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে সুখী হন নাই—যুক্তির অমোঘ পরিণামকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন যেন তেমন করিয়া সায় দেয় নাই। আমার আরও একটি ধারণা এই যে, বেদকে মুখ্য প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া রাখিলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অসংখ্য সম্প্রদায়ের অন্যতম হইয়া আজ বিরাজ করিত।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই স্রোতকেই আরও প্রবল করিয়া তুলিল, কেশব সেন যখন স্বীকার করিলেন যে,—'ব্রাহ্মরা হিন্দু নহে।' এতদিন হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মাঝে চলাচলের একটা পথ তবু ছিল, এবারে সুগভীর পরিখা খত হইল, আর এই দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা লাভ করিল, অবশ্য কেশব সেন ভক্তিমার্গের প্রবর্তন করিয়া

কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান-কৈবল্যের প্রতিষেধন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কিন্তু ততদিনে ব্যাধি যে চিকিৎসার অতীত হইয়া পড়িয়াছে।

যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সোপানাবলী বাহিয়া আমরা বর্তমান অবস্থায় নামিয়া আসিয়াছি—তাহারই কতকগুলির বর্ণনা করা হইল। আরও একটি প্রধান ধাপ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চাকুরিজীবিতা। চাকুরিজীবী ব্যক্তি ক্রমে সমাজনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে, কারণ সে মনিবকে খুশী রাখিয়া অনায়াসে আর সকলের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে পারে। সমাজের উপরে নির্ভর করিবার তাহার প্রয়োজনটা কি? পয়সা দিলেই উদ্দিষ্ট বস্তু মেলে, সেই পয়সা মেলে মনিবের কৃপায়। অতএব মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিলেই যথেষ্ট। এই সহজ তত্ত্ব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রভাবিত করিয়াছে—ফলে প্রত্যেক বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার একান্তভাবে স্বচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিরবচ্ছিন্ন দোষ নয়—কিন্তু তাহা বর্তমান যুগোচিত গুণও নয়। যাহা আমাদের তৎকালে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে—আজ তাহাই আমাদের জীবনবায়ু হরণ করিতে উদ্যত।

কিন্তু ইহাই ঊনবিংশ শতকের একমাত্র মানসিক স্বরূপ নহে। ইহারই সঙ্গে বা ইহারই প্রতিষেধকরূপে আর একটি মানসিক স্বরূপ ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, সেটি সমন্বয়ের ধারা। বিচিত্র শক্তি এবং বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সৃষ্টি—ভারতবর্ষের বিশেষ প্রতিভা। এই প্রতিভাই মনীষিগণের চিত্তে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। যাঁহারা ভারত আবিষ্কারে বাহির হইয়াছিলেন, এই সমন্বয় পন্থা আবিষ্কারও তাঁহাদেরই কীর্তি। কারণ ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বিশেষ প্রতিভা একার্থক। রামমোহন রায় এই আবিষ্কারক দলের অগ্রণী। হেয়ার-ডিরোজিও যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ধারার উৎস, রামমোহন তেমন সমন্বয়বাদীদের প্রথম। তাঁহাদের শিষ্যগণ যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন, তেমনি রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্র-নাথ, কেশব সেন প্রভৃতি ছিলেন সমন্বয়সাধকগণের অন্যতম। এই সমন্বয়ের চূড়ান্ত রূপ পাই রামকৃষ্ণদেবে ও রবীন্দ্রনাথে। যদিচ এই দুই মহাপুরুষের সাধনায় ও কর্মে দুস্তর প্রভেদ তবু ঐ জায়গাটায় মিল আছে। কেশব সেন ও বিবেকানন্দকে দুটি ধারাই স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা দুজনেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয়বাদের পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। কেশব সেনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মুখ্য, সমন্বয়বাদ গৌণ; বিবেকানন্দে ঠিক তাহার বিপরীত। কিম্বা আরও সূক্ষ্মতর বিচারের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে বলিতে হয় যে, একমাত্র রামকৃষ্ণ ব্যতীত সেকালের সকল মনীষীতেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। সেকালের সাধারণ হাওয়াটাই ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের—ইঁহারা সকলেই ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, কেহই হাওয়ার স্পর্শ এড়াইতে পারেন নাই, কেবল ইংরাজিজ্ঞানবর্জিত রামকৃষ্ণের কাছে হাওয়াটা ঘেঁষিতে পারে নাই।

তৎকালে প্রাদেশিকতা বলিয়া কোন সত্তা কাহারো পরিজ্ঞাত ছিল না, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, ভারত ছাড়া তেমনি কথা ছিল না। প্রাদেশিকতা আসিয়াছে অনেক পরে। প্রাদেশিকতা আসিয়াছে কতক পরিমাণে অনভীষ্ট কার্য্যকারণের ফলে, কতক পরিমাণে অভীষ্ট

অভিপ্রায়ের ফলস্বরূপে। বাঙলাদেশেই যেমন ভারতোপলব্ধির সূত্রপাত, বাঙলাদেশেই তেমনি প্রদেশোপলব্ধির আরম্ভ।

স্বদেশী আন্দোলনের পরোক্ষ বা অনভীষ্ট ফল বঙ্গোপলব্ধি অর্থাৎ প্রদেশোপলব্ধির চেতনা। অন্যান্য প্রদেশে এই চৈতন্য আসিয়াছে অনেক পরে, যেমন ভারত-চৈতন্যও সেই সব প্রদেশে আসিয়াছে অনেক পরে। অন্যান্য স্থানে প্রদেশচৈতন্যের প্রথম সজ্ঞান সক্রিয় সূচনা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনতন্ত্রানুমোদিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পর হইতে। এই চৈতন্যকেই প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে ১৯৪৬-৪৭ সালের মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামজাত আঘাত। উগ্র হিন্দু-চৈতন্যও প্রাদেশিক চৈতন্যের প্রকারভেদ মাত্র। উনবিংশ শতকের মনীষীরা আগে নিজেদের ভারতীয় বলিতেন, হিন্দু বলিতেন পরে। এখন আমরা আগে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই, ভারতীয় না বলিতে পারিলেই যেন বাঁচি। ইংলণ্ডের লোক নিজেদের পরিচয় দিবার সময়ে ইংরাজ বলে, খৃষ্টান বলিবার প্রয়োজন বোধ করে না।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক চৈতন্য আরও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের লোক স্ব স্ব প্রদেশের মধু-আহরণে এত ব্যস্ত যে, নিজের প্রদেশটিই তাহার কাছে ভারতবর্ষ হইয়া উঠিয়াছে—অন্য প্রদেশের স্বার্থ বা দাবী দেখিবার ইচ্ছা বা অবকাশ তাহাদের নাই। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল চলিতে থাকিলে ভারতীয় অখণ্ডতার তিরোধান অবশ্যম্ভাবী। আর এদেশের দীর্ঘকালের ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে ভারতীয় অখণ্ডতা যখনই ব্যাহত বা শিথিল হইয়াছে—তখনই এ দেশে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ মহামারী দেখা দিয়াছে। মুসলিম লীগের দাবীতে ভারতবর্ষ আজ দ্বিখণ্ডিত, আর এমন উগ্র প্রাদেশিকতা কিছুকাল চলিলে ভারত-রাষ্ট্র কতকগুলি প্রদেশের সমষ্টিতে মাত্র পরিণত হইবে। ভারতবর্ষ আজ সেই পথেরই যাত্রী। কাজেই এক হিসাবে উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষীদের সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। যাহাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতাবিষ্কার করিয়াছিলেন, আজ তাহারাই প্রাদেশিকতার ধ্বজপতাকা বহনে সমুদ্যত।

এখন সমস্ত দেশ দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ স্রোতের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি স্রোত প্রাদেশিকতাবাদের, আর একটি স্রোত সমষ্টিবাদের। উনবিংশ শতকের প্রধান ধারা দুইটিও পরস্পর বিরোধী ছিল—ভারতীয়তাবোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই কারণেই উনবিংশ শতকের মনীষা আশানুরূপ সুফল রাখিয়া যাইতে পারে নাই। এ যুগের স্বতোবিরোধী স্রোতদ্বয়ের সংঘর্ষ যে আমাদের কোথায় লইয়া ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পরিণাম শুভসূচী নহে।

এই চিত্র-চরিত্র গ্রন্থে বাংলার সকল মনীষীর নাম দেওয়া যায় নাই—এমন কি উনবিংশ শতকের সকলেরও উল্লেখ করিতে পারি নাই। কাহারো প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ অনুল্লেখ নহে। গত যুগের প্রধান প্রধান ভাবপ্রবাহের অনুবর্তনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেই ভাবপ্রবাহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনীষিগণের কীর্তি ও জীবনকথা উল্লিখিত হইয়াছে। যুগ-জীবনীর খসড়া

রচনার তাঁহারা উপাদান। তবে একথা বোধ করি সত্য যে, অন্যান্য মনীষীর চিত্র-চরিত্র অঙ্কন করিলেও যুগের স্বরূপের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইত না, কেবল দৃষ্টান্ত বাড়িত এই পর্য্যন্ত। কিন্তু মানুষের শক্তি অসীম নয় বলিয়া এক জায়গায় সীমা টানিতেই হয়। তাহাতে লেখকের শক্তির অভাব প্রমাণ হয়, শ্রদ্ধার অভাব নয়।

এই গ্রন্থ রচনায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নামে সুপরিচিত গ্রন্থ হইতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাইয়াছি। বস্তুতঃ এই সুলিখিত গ্রন্থকে চিত্র-চরিত্রের অগ্রজ মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক চরিতমালা নামে বাংলার সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসের যে ধারাবাহিক খসড়া প্রকাশিত করিতেছেন, তাহার সাহায্য না লইয়া উনবিংশ শতক সম্বন্ধে কাজ করা সম্ভব নহে। আমি তো বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ইঁহারাই আমার প্রধান উত্তমর্ণ। ছোটখাটো উত্তমর্ণের নাম করিতে হইলে তালিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে —তাঁহাদের সকলের সাহায্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। 'দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিলে প্রত্যবায় হইবে—তাঁহারা সহিষ্ণু না হইলে চিত্র-চরিত্র নিশ্চয় প্রকাশের সুযোগ পাইত না।

সর্বশেষে দেশ পত্রিকার পাঠকবর্গের বর্ষব্যাপী সহিষ্ণুতার জন্য সপ্রশংস সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

২৩-১০-৪৮



রাজা রামমোহন



পরমহংস দেব



ডেভিড হেয়ার



উইলিয়াম কেরী

রাজা রামমোহন

রাজা রামমোহন নব্য ভারতের ব্রাহ্ম মুহূর্তের বিরাট পুরুষ।

ব্রিগস অঙ্কিত রামমোহনের একখানি তৈলচিত্র আছে। এই ছবিখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ছবিটির পটভূমিতে বামাংশ ঘেঁষিয়া একটি মসজিদ, আরও একটু বামে একটি মন্দির, খানিকটা মাত্র দৃশ্য, পটভূমির দক্ষিণাংশ একটি স্তম্ভের ছায়ায় প্রায়ান্ধকার, প্রায়ান্তর্হিত, কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ থাকিয়া যায়, একটু সরিলেই একটি গির্জা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য পটভূমি একটি আদর্শ ভূমি এবং সাহেবের দৃষ্টির ভারতভূমি। ভারতবর্ষের মন্দির মসজিদ গির্জা, ভারতবর্ষের নারিকেলকুঞ্জ এবং অজ্ঞাত পরিচয় তরুরাজির প্রচুর শ্যামলিমা। কিছুই বাদ পড়ে নাই, কেবল খুব সম্ভব বিনয়বশাৎ গির্জাটিকে সাহেব গোপনে রাখিয়াছেন। বিনয় না কূটনীতি!

ছবিখানির পুরোভাগ অধিকার করিয়া শালপ্রাংশু রামমোহন। রামমোহনের উচ্চতা সবিশেষ জানি না, দীর্ঘাকার ছিলেন বলিয়াই পরিজ্ঞাত। আভূমি-বিলম্বিত জোব্বা পরিধান হেতু তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘতা দীর্ঘতর বলিয়া প্রতিভাত। উর্দ্ধাঙ্গে একখানি মূল্যবান শাল জড়িত। দক্ষিণ হাতে লাল রঙের একখানি গ্রন্থ, পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তর্জনীর দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্ক এখনো চিহ্নিত। রাজার শিরোদেশের শালের পাগড়ি ও কুঞ্চিত বাবরি স্মরণ করাইয়া দেয়, মনের বিচারে তিনি চিরকালীন হইলেও কালের বিচারে সেই সময়কার, যখন বাবরি রাখাই সাধারণ নিয়ম ছিল, যদিচ তার উপর শালের পাগড়ি সকলের জুটিত না। পূর্ণায়ত অধরোষ্ঠের উপরে স্বল্প গুম্ফ, আর গম্বুজ সদৃশ ললাটের নীচে ক্ষুদ্রায়ত চোখ দুইটির দৃষ্টি উদার, শান্ত এবং দূরদর্শী। কিন্তু ঈষৎ একটু যেন টেরা। মহত্তের সঙ্গে টেরাচোখের অসামঞ্জস্য নাই।

আমাদের দৃষ্টি যতই বাস্তবপন্থ হোক রামমোহনের বাস্তব মূর্তি কল্পনায় আচ্ছন্ন।

অপরকালে একজন বিদেশী যে দৃষ্টিতে রামমোহনকে দেখিয়াছিল, এখানে তার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার বর্ণনায় রামমোহনের বস্তুগত রূপ ধরা পড়ে। লোকটি বলিতেছে রামমোহনের দেহকে স্থূল না বলিয়া বলিষ্ঠ বলা উচিত, না-ফর্সা, না-কালো, তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুপাতে চোখ দুইটি ছোট, নাকটা দক্ষিণ দিকে একটু হেলানো; গুম্ফ স্বল্প, চুল দীর্ঘ, ঘন এবং কুঞ্চিত; তাঁহার অবয়বে শক্তি, শান্তি ও সম্ভ্রম বিরাজিত। বিদেশীর এই বর্ণনা আমাদিগকে অনেক পরিমাণে বাস্তব রামমোহনের কাছে লইয়া যায়। নাকের দক্ষিণায়ন গতির উল্লেখ ভাবমূর্তিতে অচল।

আর একটি বালক রামমোহনের বর্ণনা করিয়াছেন; বালক বলিয়াই তাঁহার চোখে বাস্তব মানুষটি ধরা পড়িয়াছে, বালক বলিয়াই মহিমার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনকে তাঁহার দেখিতে

হয় নাই। বালকটির বয়স আট নয় বৎসর, নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বালক দেবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে রাজাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এত ঘনিষ্ঠ যে অনাবৃত দেহ। খাটো একখানা তেলধুতি পরিহিত বলিষ্ঠ বিশাল পুরুষ রামমোহন সারা গায়ে প্রচুর তেল মাখিয়া প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন এই দৃশ্য দেবেন্দ্রনাথকে ভীত করিয়া তুলিত।

কখনো প্রাতরাশের সময় দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে রামমোহন বলিতেন, 'দেখো বেরাদার, আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, আর লোকে বলে আমি গোমাংস খাই।'

আবার কখনো কখনো বালক দেবেন্দ্রনাথকে দোলনায় দোলাইতে দোলাইতে অবশেষে বলিতেন, 'বেরাদার, এবার আমাকে দোল দাও দেখি!'

দুপুরবেলা নিজের বাগানে লিচু-লোভী দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিতেন, 'রৌদ্রে ঘুরিও না, কত লিচু খাইবে খাও।' রাজার ইঙ্গিতে মালি সরস, নধর, আরক্ত লিচুর গুচ্ছ আনিয়া বালকের হাতে দিত।

এই সব ছবির টুকরায় রাজার যে পরিচয় পাওয়া যায় এমন আর কিসে? মানুষমাত্রেই অভিনেতা। অভিনেতার আসল পরিচয় নেপথ্যে, মানুষের আসল পরিচয় বালকের চোখে। বালকেরা মানুষ চিনিতে প্রায়ই ভুল করে না, তাহাদের মতো মনস্তত্ত্বের অশিক্ষিত পটুতা আর কাহার?

রামমোহনকে যে আমরা এখনো সম্যক বুঝিতে পারি নাই, তার কারণ তাঁহাকে আমরা শিষ্যের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, ভক্তের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, বয়স্কের ও অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বালকের দৃষ্টিতে দেখি নাই। আর একটা কারণ রামমোহন একান্তভাবে ভারতবর্ষীয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার চরিত্রের নজির নাই। এদেশে তাঁহার চেয়ে মহত্তর বৃহত্তর পুরুষ জন্মিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এই শ্রেণীর পুরুষ আর আগে জন্মায় নাই। কোন্ রহস্যবলে ইউরোপীয় রেনেসাঁস-মন্ত্রকে তিনি যেন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। দাবানলের স্ফুলিঙ্গ কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া আসিয়া পড়ে, রেনেসাঁস-দাবানলের স্ফুলিঙ্গ তাঁহার চিত্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই রামমোহনের বিচারের পরিপ্রেক্ষিত এদেশের মহাপুরুষগণের চরিত্র নয়, রেনেসাঁস-পরবর্তী ইউরোপীয় মনীষিগণ। মানুষ হিসাবে তিনিই প্রথম রেনেসাঁসবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিল্পীহিসাবে প্রথম যেমন মাইকেল মধুসূদন। অথচ এক সময়ে আমরা মধুসূদনের তুলনা করিতাম ভারতচন্দ্রের সঙ্গে। মাইকেলের পটভূমি মিলটন। রামমোহনের পটভূমি এদেশীয় কেহ নয়। যে-বিদেশী মনীষীর সঙ্গে তাঁহার অন্তর্জীবন, জীবনদর্শন ও সাধনগতির সর্বাধিক ঐক্য—তাঁহার নাম বেকন। দুজনেই অদম্য জ্ঞান-গরুড়!

"তরুণ গরুড় সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে............
অমর বিহঙ্গ শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা আপন বিরাট নীড়।"

সেই বিশ্বের নাম অখণ্ড-মানব জীবন।

বেকনের সমকালীন Marlow, Faust-এর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বর্ণনা করিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তির তীব্রতা একটা উচ্চ স্তরে গিয়া পৌছিলে মহত্তর ক্ষুধায় পরিণত যে হইতে পারে, মধ্যযুগের সাধনা এই সত্য বুঝিত না। এই সত্য রেণেস াঁসের আবিষ্কৃতি। যে অগ্নিতে সীতা দগ্ধ হন নাই, অথচ লঙ্কা ভস্মীভূত হইয়াছিল দুই কি এক নয়? গ্রীক-সংস্কৃতির স্বর্ণ-কুম্ভের অবারিত গর্ভ হইতে বহির্গত Faust Spirit দশক্রোশী ধাপ ফেলিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে। মানবজীবনের কোন প্রদেশই তাহার কাছে নগণ্য নয়, অগণ্য নয়। Goethe Faust চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই যে Faust! তাই তো সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি সর্বত্র তাঁহার গতি! বেকনের ছিল 'মানবজীবনের সমগ্রতা তাঁহার জ্ঞানের পরিধি।' রামমোহনেরও যে তাই! সেইজন্যই দেখি—এদেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সর্ববিষয়ে তাঁহার সমান আসক্তি। অবশেষে বেদান্তপ্রচারক এই মনীষীকে দিল্লীর বাদশাহের রাজদূত হইয়া ইংলণ্ড যাইতে হইল। একি বিচিত্র নয়? কিন্তু বৈচিত্র্যই যে রেণেস াঁসের জীবন-স্পন্দন! রামমোহন বৈদান্তিক না হইয়াও বেদান্তপ্রচারক, আর ধর্মগুরু হইয়াও অর্থার্জনে উদাসীন নহেন। অর্থ ও পরম-অর্থকে একত্র সমন্বয়ের চেষ্টা, স্বর্গ ও মর্ত্য, ইহলোক ও পরলোককে সমমূল্যে স্বীকার করিবার চেষ্টারই রূপান্তর। এই মৌলিক সত্যটুকু না বুঝিলে অনেক রেণেস াঁস চরিত্র দুর্বোধ্য ঠেকিবে, মহত্ত্বের ও নীচত্বের এমনি সূক্ষ্ম মিশ্রণ! দাভিঞ্চি, বেনভেনুতো সেলিনি, বেকন।

রামমোহন অর্থোপার্জনে অবহেলা করেন নাই; কারণ সংসার তাঁহার কাছে অবহেলার যোগ্য ছিল না। রেণেস াঁসের এই লক্ষণটি বাঙালীর সংস্কৃতিকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। মাইকেল চল্লিশ হাজার টাকা স্বপ্ন দেখিতেন। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণ তাঁহার কল্পনাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের অগোচরে এই রেণেস াঁস ধর্মকেই বরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এত মহাপুরুষের মধ্যে যাঁহাকে তিনি আদর্শ মানব বলিয়া গ্রহণ করিলেন তিনি মথুরাপতি কৃষ্ণ, রণনীতিক, রাজনীতিক এবং ধর্মপ্রচারক; ব্রজের গোপালকে বঙ্কিমচন্দ্র বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ আদর্শ মানব হইতে পারেন; কিন্তু সে কেবল রেণেস াঁস-বাদীর দৃষ্টিতেই। রবীন্দ্রনাথও এই ধারার অন্তর্গত। তাঁহার ভগবান রাজা। ভগবানের রাজরূপই তাঁহার প্রিয়তম।

রামমোহনের দৃষ্টিতেও ভগবান রাজা। দরবারী পোষাকে সজ্জিত হইয়া তিনি উপাসনা-গৃহে যাইতেন। বলিতেন, 'যিনি রাজার রাজা, সকলের প্রভু তাঁহার দরবারে কি দীনের মতো যাওয়া চলে।'

রামমোহনকে বুঝিতে হইলে রেণেস াঁসের ইন্দ্রধনুর তোরণের তল দিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তার ফলে তাঁহাকে যদি সম্পূর্ণ আমাদের দেশের বলিয়া মনে না হয়, তবু সম্পূর্ণ আমাদের সকলের বলিয়া নিশ্চয় মনে হইবে।

অর্থোপার্জনকে যাঁহারা হীন মনে করেন, বাঈজীর গানের আসরকে আধ্যাত্মিক সীমান্তের বহির্ভূত মনে করেন, কূটনীতির সূত্রধারণকে দুর্নীতি বলিয়া মনে করেন, সেই সব দুর্বলঘরুৎ ব্যক্তিদের জন্য রামমোহন চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই। রামমোহন-চরিত্রে উচ্চাবচতা ছিল, উচ্চাবচ না হইলে কি পর্বতমালা হয়? নীতিবাগীশ ও ধর্মধ্বজিগণ রামমোহন-চরিত্রের খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করুক। দোষগুণ ভুলভ্রান্তি লইয়া মানবজীবন যাহাদের প্রিয়, রামমোহন তাহাদের বান্ধব। তিনি 'আধুনিক মানুষ।'

পরমহংসদেব

কোন জড়বস্তুর সহিত নির্বিকার চৈতন্যের তুলনা যদি চলে, তবে সে বস্তু চিরহিমানী স্তূপ। হিমাচলের নিরুদ্দিষ্ট উত্তুঙ্গতায় চির-সংহত তুষারপুঞ্জ বিরাজমান। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানকালে তাহাদের যেমনটি দেখিয়াছিলেন, তাহারা আজিও তেমনি অবিকারী। পুঞ্জীভূত সত্বগুণের মতো সেই শান্ত, শুদ্ধ, শুভ্র, তুষার-জগতের সহিত নির্বিকার চৈতন্যের পরোক্ষ তুলনা চলিলেও চলিতে পারে। সেখানে যেন পঞ্চভূতের নির্বিকল্প সমাধি। সেই সমাধি ছায়ায় দাঁড়াইলে সহসা কি কল্পনা করিতে পারা যায় যে, এই মহামৌনের স্তরে স্তরে একটা সমগ্র মহাদেশকে লালিত করিবার শক্তি ও সম্পদ ঘনীভূত হইয়া নিদ্রিত! মানসকেন্দ্রিক হিমানী-জগৎ যেসব মহাবেগবান নদ-নদীকে ভারতবর্ষের দিকে দিকে নিক্ষেপ করিয়াছে—এখানে দাঁড়াইলে সহসা কি তাহাদের কল্পনা করা যায়? সিন্ধু, শতদ্রু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের পূর্বসূত্র যে এই নৈঃশব্দের নেপথ্যে অন্তর্নিহিত; নিতান্ত বিস্ময়কর হইলেও—ইহাই তো সত্য। নির্বিকার হিমানী স্তূপ ভারতবর্ষের নদ-নদীকে অবলম্বন করিয়াই তো সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। দুই-ই এক, কেবল অবস্থান্তর। চিরহিমানীর নির্বিকার চৈতন্য নদ-নদী প্রবাহে সক্রিয় চৈতন্যরূপে প্রোদ্ভাসিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ওই চিরহিমানী স্তূপ, নির্বিকার চৈতন্য; তাঁহার শিষ্যগণ নদ-নদী প্রবাহ, সক্রিয় চৈতন্য। রামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চৈতন্যই শিষ্য-প্রবাহে বিগলিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে, অকৃপণ ঔদার্য্যে একটা সমগ্র দেশকে সিক্ত, সিঞ্চিত, গততৃষ্ণ করিয়াছে। চিরহিমানীকে মানবনিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় মনে করিলেও বস্তুত তাহা নয়, আত্মবিগলিত ধারায় মর্ত্যজনের তৃষ্ণার ঘাটে ঘাটে সে প্রবাহিত। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণকে, বিশেষভাবে বিবেকানন্দকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তাঁহার লীলার সমগ্র রূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। দুইজনে একই চৈতন্যের অবস্থান্তর; পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই জন্যই পরস্পরে এত আকর্ষণ; ঠাকুর নিজেও বহুবার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমহংসদেবের দুইখানি ছবি দেখিয়াছি। একখানিতে তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। এখানা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকৃতি। ঈষন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের ফাঁকে দুইটি দাঁত দেখা যাইতেছে, কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার মতো তাঁহার চোখ দুইটি। চোখ দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিতপ্রায়, ভাবাবেশে নয়, খুব সম্ভবত স্বভাববশে। নিমীলিতপ্রায় চোখের দৃষ্টি দিয়া সংসারের প্রকৃত চেহারাকে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা বলিয়া মনে হয়। মহৎভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না। স্বাভাবিক অবস্থায় সংসারের রীতি-নীতি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তিনি একান্ত সচেতন ছিলেন। কোথাও যাইবার সময়ে তাঁহার গামছাখানি

সঙ্গে লওয়া হইল কিনা, সেদিকেও তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একবার এক মহোৎসবের মেলায় শ্রীসারদাদেবী সঙ্গে যাইবেন না শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন, "ভালোই হলো, দু'জ:ন একত্রে গেলে সবাই বলতো হংস-হংসী এসেছে।" নিজেকে লইয়া বিদ্রূপ করিবার মতো ক্ষমতা সব মহাপুরুষের থাকে না। অনেক মহাপুরুষ অত্যন্ত বেশী মহাপুরুষ এবং অষ্টপ্রহর মহাপুরুষ। তাঁহাদের সঙ্গ নিশ্চয়ই আসঙ্গকর নয়। রামকৃষ্ণদেবের লোকোত্তর গুণ সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁহার লৌকিক গুণও অল্প নহে। এমন চিত্তাকর্ষক সংলাপী সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীম.........রামকৃষ্ণদেবের বস্‌ওয়েল।

রামকৃষ্ণদেবের আর একখানি ছবি ভাবাবিষ্ট অবস্থার। দণ্ডায়মান মূর্তি; দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে ইঙ্গিতশীল; বাম হস্তে পরমানন্দের মুদ্রা; পরিধানে শুভ্র বসন ও পিরান, আর অন্তর্লীন-ইন্দ্রিয়গ্রাম মুখমণ্ডলে এক দিব্য লোকাতীত জ্যোতি। নিতান্ত অন্ধেও বলিয়া দিতে পারে যে, এই লোকটি এই মুহূর্তে পৃথিবীর অঙ্গীভূত নয়, তাঁহার অস্তিত্ব যেন কোন্ তূরীয়লোক স্পর্শ করিয়াছে। এই ছবি দুখানিতে রামকৃষ্ণ-জীবন-ধনুকের দুই কোটি, এক কোটি ভূমি-স্পৃষ্ট, অপর কোটি দিব্যলোককে স্পর্শ করিয়া আছে, এক কোটিতে তিনি শিষ্যবৎসল গুরু, মানববৎসল বান্ধব, অপর কোটিতে আত্মমগ্ন, সিন্ধুতে বিন্দুলীন সত্তা, এক কোটিতে নির্বিকার চৈতন্য, অপর কোটিতে সক্রিয় চেতনা। রামকৃষ্ণ অদ্বৈতপন্থা ও দ্বৈতপন্থা—দুটিতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ছবি দুখানি যেন তারই একপ্রকার প্রতীক। বাস্তবিক ভারতবর্ষীয় ধর্ম-জগতে যতগুলি সাধনপথ আছে, রামকৃষ্ণ সবগুলিরই সার্থক পথিক। আর শুধু ভারতীয়ই বা কেন, খৃষ্টীয়, ইসলামি প্রভৃতি পন্থাও তিনি অধিগত করিয়াছিলেন। রামমোহনের সময় হইতে বঙ্গীয় উনবিংশ শতক কখনো অগোচরে, কখনো সগোচরে যে সমন্বয়সিদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছিল, রামকৃষ্ণে তাহার চরম। রামমোহনে যাহা সচেতন, রামকৃষ্ণে তাহা স্বাভাবিক, স্বাভাবিক বলিয়াই খুব সম্ভব তাহার মূল্য সমধিক। রামমোহনে যাহা সূত্র, রামকৃষ্ণে তাহারই সাধনা। মহাধীমান রামমোহনের কার্য্য প্রায়-নিরক্ষর এই মহাপুরুষ সার্থকতরভাবে উদ্‌যাপন করিতেছিলেন, সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়সাধনের মহৎ কার্য্য। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতকও শেষ পাদে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

বাঙলার উনবিংশ শতক বুদ্ধি গৌরবে দীপ্ত, বৃহত্তর জগতের সংস্রবে গরীয়ান। এই দুটিই তাহার এবং সে সময়কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বিশিষ্ট লক্ষণ। দক্ষিণেশ্বরের এই অজ্ঞাতপ্রায় সাধকের লক্ষণ দুটির কোনটিই ছিল না। তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ডতম ও গভীরতম বলা যায়। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অন্তর্জাত। বিচিত্র সাধনপন্থাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে যে শক্তির আবশ্যক, তাহা কি প্রচণ্ড! হিমালয়ের তুষার কোটি কোটি বৈদ্যুতিক অশ্ব-শক্তি সংহত করিয়া রাখিয়াছে। আবার সেই ব্যক্তিত্বের গভীরতাও কি অপরিসীম! সচেতন প্রয়াসের বহু যুগসঞ্জাত সংস্কারের শিলীভূত স্তরপর্য্যায় সবলে উৎখাত করিয়া দিয়া আত্মার অবলুপ্ত মহেঞ্জোদেড়োকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন এই ভক্ত সাধক। তাঁহার জীবনের অনেক

অলৌকিক অভিজ্ঞতা বিশ্বাসের প্রত্যন্ত-ঘেঁষা। মহেঞ্জোদেড়োর অস্তিত্বও কি পূর্ণবিশ্বাসযোগ্য? রামকৃষ্ণের সব অভিজ্ঞতা এখনো সাধারণের আয়ত্ত নয়, মহেঞ্জোদেড়োর ভাষার চাবিকাঠি তো আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তৎসত্ত্বেও মহেঞ্জোদেড়ো আমাদের ইতিহাসের পরিধিকে বিস্তীর্ণতর করিয়া প্রাক্-ইতিহাসের কোঠায় ঠেলিয়া দিয়াছে। রামকৃষ্ণ কি আমাদের আধ্যাত্মিক পরিধি বাড়াইয়া দেন নাই? আমাদের ক্ষুদ্র ইহ-কে প্রাক্-ইহর সহিত যুক্ত করেন নাই? মহেঞ্জোদেড়োর রহস্যসন্ধানীকে বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করিতে হয়। রামকৃষ্ণ রহস্য-সন্ধানীকেও তাঁহার শিষ্যদের উপর, ভক্তদের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ইতিহাসকে নিতান্ত জড়বাদীর দৃষ্টিতে না দেখিয়া যদি তাহার ঘটনাস্রোতে বিধাতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে বাদ ও প্রতিবাদকে বিধাতা একই সময়ে বপন করিয়া থাকেন। বন্য মহিষ আততায়ী ব্যাঘ্রকে যেমন দুই শৃঙ্গের আঘাত প্রত্যাঘাতে ঠেলিয়া লইয়া চলে, বাদ-প্রতিবাদের ঠেলাতেও ঘটনাপ্রবাহ তেমনি গতি পায়। ১৮৩৫-এ বাঙলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার সরকারী স্বচনা; ১৮৩৬-এ রামকৃষ্ণদেবের জন্ম; একটার টান বাহিরে, আর একটার টান ভিতরে; আর এই দুইয়ের টানাটানির সমন্বয়ের পথে নব্যবঙ্গের যাত্রা। লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় এই যে, নিরক্ষরপ্রায়, ইংরেজি-না-জানা এই সাধকের অধিকাংশ গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসী শিষ্য তখনকার পরিভাষায় যাহাদের বলিত, 'ইয়ং বেঙ্গল।' 'ইয়ং বেঙ্গলের' অবিশ্বাস, আর 'ওল্ড ফুলদের' অতি-বিশ্বাস, দুইয়ের ঠেলা-ঠেলিতে নব্য-বঙ্গের বিশ্বাসের স্বত্রপাত। মধ্যযুগীয় সাধনপন্থা, আর চিরযুগীয় সাধন-লক্ষ্য, দুইয়ের টানা-টানিতে নবযুগের সিংহদ্বার খুলিয়া গেল। শিক্ষাভিমানী বাঙলা দেশের ভাব-সাধনার গুরু এক নিরক্ষরপ্রায় সাধক।

'পরমহংস' শব্দটির কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিলে জানি না। তবে ইহার প্রকৃতি-গত ইঙ্গিতটি বড় মনোরম। শরতের শেষে মানস সরোবর ত্যাগ করিয়া হাঁসের দল স্বদূর দক্ষিণে চলিয়া যায়, বসন্তের প্রারম্ভে আবার তাহারা 'গলিত-নীহার' কৈলাসকে লক্ষ্য করিয়া মানসে ফিরিয়া আসিয়া গতিচক্র সম্পূর্ণ করে। পরমহংস বিশ্ব-মানস হইতে যাত্রা-লীলা শুরু করিয়া আবার বিশ্ব-মানসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন—তাহার পক্ষবিধূননে অন্তরাকাশ এখনো স্পন্দিত।

ডেবিড হেয়ার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে কয়েকজন সাধু ও সহৃদয় ইংরাজ এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশের সুখদুঃখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়া কার্য্যত এদেশকে স্বদেশ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ বা ব্যবসা করিতে, কেহ বা চাকুরি করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবন সেইসব উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল; তাঁহারা এদেশীয় হইয়া গিয়া ইংরাজ চরিত্রের প্রতি একটা বিশ্বাস তৎকালীনদের মনে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সব উপকারের সূত্রে তাঁহারা একটি মহদপকার করিয়া গিয়াছেন। নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁহারা পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি ব্যবসায়ে বা বন্দুকে নয়, শাসকের কৌশলে বা কূটনীতিজ্ঞতায় নয়, শাসিত প্রজার বিশ্বাসে এবং আস্থায়। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী বিশ্বাস করিত যে ইংরাজ এদেশের মঙ্গল কামনাতেই অগ্রসর হইয়াছে—এই বিশ্বাসের কারণ ডেবিড হেয়ার ও বেথুনের মতো মহাপ্রাণ ইংরাজ সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা। এদেশের প্রীতি ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে তৎকালীন ইংরাজ শাসকগণ পারেন নাই, মিশনারীগণ পারেন নাই, সে কাজ হেয়ার ও বেথুনের দল করিয়াছিলেন। অথচ একথাটা কোন পক্ষই বুঝিতে পারে নাই, না তাঁহারা নিজেরা, না তৎকালীন লোকে, আর বিদেশী শাসকগণ তো অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন। আমার উক্তির প্রমাণ পাওয়া যাইবে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীদের ধারণায়। সেকালের বাঙালীসমাজের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠগণ, মনীষিগণ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত সকলেই সিপাহী বিদ্রোহকে দেশদ্রোহাত্মক কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, সিপাহিগণ এমন একটা শাসনব্যবস্থাকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহার ধারক এবং বাহক হেয়ার ও বেথুনের মতো সহৃদয় ও সাধু ব্যক্তি। একালের ঐতিহাসিকগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধারণা পোষণ করেন না, তাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলিয়াই গণ্য করেন। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিতে বিলম্ব হইবার কারণ এইসব ইংরাজের সহৃদয়তার স্মৃতি।

ডেবিড হেয়ার এদেশে ইংরাজি শিক্ষার গুরুমহাশয়। প্রদেশের প্রধান গুরু ট্রেনিং কলেজের সহিত তাঁহার নামের যোগ নিতান্ত ইতিহাসসম্মত। সেকালে ইংরাজি শিক্ষার উপকারিতা যখন লোকে ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছিল, তখন হেয়ার ইংরাজি পাঠশালা স্থাপন করিতেছিলেন। এইসব পাঠশালায় ভর্তি হইবার আশায় উমেদার ছাত্র ও অভিভাবকদের চিত্র একালের যে-সব কৃতবিদ্য ছাত্র ইংরাজি পড়িয়াও চাকুরী পায় না তাহাদের কাছে কৌতূহলজনক মনে হইবে।

রামতনু লাহিড়ী বাঙালীসমাজের অলঙ্কার। ইংরাজি শিখিবার আশায় বাল্যকালে তিনি অভিভাবকের সহিত হেয়ারের দ্বারস্থ হন। হেয়ার বলিলেন যে, ফ্রী ছাত্র লইবার আর উপায় নাই, সব সিটগুলি ভর্তি হইয়া গিয়াছে। তখন রামতনু বুঝিলেন যে এবারে হেয়ারের পাল্কীর দ্বারস্থ হইতে হইবে। হেয়ার পাল্কী করিয়া পাঠশালা পরিদর্শনে বাহির হইলে ছাত্র-উমেদারগণ "Me Poor boy, have pity on me, me take in your school." বলিয়া পাশে পাশে ছুটিত। রামতনুও তাহাদের দলবর্দ্ধন করিয়া পাল্কী-দৌড় শুরু করিলেন। "হেয়ারের পাল্কী নানাস্থানে যাইত এবং এক এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত। রামতনু সর্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা করিতেন। একদিন অপরাহ্ণে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। অনুমানে বুঝিলেন সেদিন তাহার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে?' বালক রামতনু আহারের কথা শুনিয়াই ভয় পাইলেন, বিদেশীয় ও বিধর্মী লোকের ভবনে আহার করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'না, আমার ক্ষুধা পায় নাই।' হেয়ার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আমাকে সত্য বলো, আমার বাটীতে তোমাকে খাইতে হইবে না, ঐ মিঠাইওয়ালা তোমাকে খাইতে দিবে। সত্য করিয়া বলো আজ আহার করিয়াছ কি না?' বালক রামতনু কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'আজ আমার খাওয়া হয় নাই'। তখন মহামতি হেয়ার তাঁহার মিঠাইওয়ালাকে পেট ভরিয়া মিঠাই খাইতে দিতে বলিলেন। এই প্রকারে দিবাশেষে অনেকদিন হেয়ারের মিঠাইওয়ালার নিকট তাঁহার দিনের আহার মিলিত।" অনেকদিন হেয়ারের মিঠাইওয়ালার মিঠাই না খাইয়া বোধকরি কেহ তাঁহার স্কুলে ভর্তি হইতে পারে নাই। হেয়ার স্কুল বসিবার বা ভাঙিবার সময়ে গামছা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, অপরিচ্ছন্ন বালকদের গা মুছিয়া দিতেন। ফ্রী ছাত্ররা অপরিচ্ছন্নভাবে আসিলে তাহাদের জরিমানা হইত। কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইলে তাহার সন্ধান লইতে তিনি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি ছাত্রকে আগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বর্তমান হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে পটলডাঙা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। বাড়ীর কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছাত্রটিকে যাইতে বলিলেন। ছাত্রটি চলিয়া গেলে মনে করিলেন—একবার দেখিয়া আসি নিরাপদে পৌছিল কি না! সেকালে পথে ঘাটে গোরার অত্যাচার ছিল। কিছুক্ষণ পরে ছাত্রটির বাড়ির লোকে বিলাতি কণ্ঠের শব্দ শুনিল—'Is Chunder in?' গোরার আক্রমণ আশঙ্কায় সকলে ভীত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া আগন্তুক হিন্দিতে বলিলেন—'ডরো মৎ, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়।' সেকালের লোকে হেয়ার সাহেব ও অন্য গোরাতে প্রভেদ বুঝিত! তাহারা আরও বুঝিত যে হেয়ার সাহেব কখনও তাহাদের ছেলেদের খৃস্টান করিবেন না। হেয়ার সাহেব নাস্তিক কি না সে সন্ধান তাহারা রাখিত না, আর রাখিলেই বা কি, এমন সাধু ও সহৃদয় ব্যক্তি কি নাস্তিক হইতে পারে—আর হইলেই বা কি! তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু মানুষে তো

বিশ্বাস করেন! মানুষেও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। এইরূপ বিশ্বাসের সুযোগের সূত্র লইয়া ইংরাজ শাসন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

হেয়ার সাহেবের জীবন-চিত্র জটিল নয়। ১৭৭৫ সালে স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম। ১৮০০ সালে ঘড়ির ব্যবসা করিতে তিনি এদেশে আসেন। ১৮২০ সালে ঘড়ির ব্যবসা বিক্রয় করিয়া পুরাপুরি লোকহিতব্রতে মন দেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু। ঘড়ির ব্যবসা করিয়া তিনি যে প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই তিনি লোকশিক্ষায় ব্যয় করিয়া গেলেন। শেষজীবনে অর্থাভাবে পড়িয়া তাঁহাকে একটি সরকারী চাকুরি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। আর পুরাপুরি বা আংশিক ব্যয় করিয়া শিমলা, আরপুলি ও পটলডাঙায় পাঠশালা পরিচালনা করিতেন। কর্মের বহুলতায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য নয়, ইহার চেয়ে দীর্ঘতর কাজের তালিকা অনেকের নামের সঙ্গেই সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। কর্মের অন্তর্নিহিত হৃদয়বত্তায় তাঁহার স্বরূপ পরিচয়, নতুবা যে-যুগে পথচারী গোরা পথিকের শত্রু ছিল, সেই যুগের লোকে 'ডরো মৎ, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়' শুনিয়া আশ্বাস পাইত কিরূপে?

বলা বাহুল্য এ হেন লোককে স্বসমাজের সকলে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। তাহারা মনে করিত যে তিনি ভারতীয়দের সহিত স্বজাতির মর্য্যাদাহানিকর আচরণ করিতেছেন। বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান দিবার বিরুদ্ধে যিনি প্রতিকূলতা করেন ইংরাজেরা তাঁহাকে স্বার্থের অনুকূল মনে করিতে পারে না। হেয়ারের সরকারী চাকুরিপ্রাপ্তিতে একখানি ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। আর হেয়ারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রশস্ততম অবসর পাইল পাদ্রির দল, তাঁহার মৃত্যুর পরে। পাদ্রিরা বলিল—নাস্তিক হেয়ারকে খৃষ্টানি গোরস্থানে সমাধিস্থ করা চলিবে না। তখন বাঙালীসমাজ শ্রদ্ধার সহিত, আড়ম্বরের সহিত তাঁহার মৃতদেহ গোলদীঘিতে আনিয়া সমাধিস্থ করিল। আজিও সেখানে তিনি সমাহিত হইয়া আছেন। সন্ধ্যাবেলায় ছাত্ররা যখন দীঘি আবর্তনে ক্লান্ত হইয়া কাছাকাছি কোথাও বসিয়া ইংরাজি শিখিয়া আর চাকুরি পাওয়া যায় না মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে—তখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তক কি মনে করেন জানিতে কৌতূহল হওয়া একান্ত স্বাভাবিক! আর হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে চির-দণ্ডায়মান তাঁহার মূর্তি কলেজ ষ্ট্রীটের ছাত্রপ্রবাহের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পায়—পাশাপাশি একটা ছাত্রীধারাও প্রবাহিত। হেয়ারের মূর্তি নিতান্ত প্রাণহীন না হইলে ইংরাজ শাসনের অবসান দেখিয়া নিশ্চয়ই উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিত। পাথরের হাততালিতে লোকে চমকিয়া উঠিলে অশ্রুতকণ্ঠে তাহারা শুনিতে পাইত—'ডরো মৎ, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়।'

উইলিয়ম কেরী

উইলিয়ম কেরী যদি এদেশে পদার্পণ না করিতেন, বিলাতী সিভিলিয়ানগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যদি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত না হইত, তথাপি বাঙলা গদ্যসৃষ্টির অন্তরায় ঘটিত না। এই দুটি ঘটনায় বাঙলা গদ্য সৃষ্টির পথ সুগম হইয়াছিল—এ দুটি না ঘটিলেও অনতিকাল মধ্যে বাঙলা গদ্য আকার লাভ যে করিত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; কারণ গদ্য রচনার পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক সেই মূল কার্য্যকারণের সমাবেশ তৎকালীন বাঙলা দেশে দেখা দিয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনভার গ্রহণের সঙ্গেই এদেশে কর্মব্যস্ততার যুগ আসিয়া পড়িয়াছিল। গদ্য কর্মব্যস্ত মানুষের পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন সুমুদ্রিত না হইতে পারে, সুসমঞ্জস না হইতে পারে, নিখুঁৎ রেখার সমাবেশ তাহাতে না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা যে বাস্তব সক্রিয় ও ব্যস্ত মানুষের পায়ের ছাপ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাবের পূর্বেও বাঙালাদেশে কর্মের অভাব ছিল না, কিন্তু সে কর্মে ব্যস্ততা ছিল না। বাঙালীসমাজ তাহার অভ্যস্ত চালে এবং পুরাতন চলনে নিযুক্ত ছিল। যে কর্ম একান্ত অভ্যস্ত তাহা হইতে ব্যস্ততা বাদ পড়িয়া যায়। সাধকের হাতে জপমালা নিরন্তর আবর্তিত হইয়াই চলিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্যস্ততা কোথায়? হঠাৎ যখন কালের গতিকে সেই সাধককে জপমালা ফেলিয়া রথের রশি ধরিতে হয়, তখন সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আবার কালের আরও পরিবর্তনে রথের রশি ফেলিয়া তাহাকে যদি ইঁদারার রশি ধরিতে হয় তবে ব্যস্ততার অন্ত থাকে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন জীবনযাত্রা বাঙলাদেশের অভ্যস্ত অঙ্গুলী হইতে জপমালা ও রথের রশি খসাইয়া লইয়া ইঁদারার কর্কশ রশি গাছটা ধরাইয়া দিল। অভ্যস্ত চাল চলন হইতে চমকিত হইয়া বাঙলাদেশ নূতন পরিবেশে জাগিয়া উঠিল—এই নূতন জাগরণের প্রভাতে কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রাকে প্রকাশের যে বাহন সে আবিষ্কার করিল তাহাই বাঙলা গদ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন যে গদ্য আবিষ্কারের পটভূমি, উইলিয়ম কেরী নামে একজন ইংরাজ যে তাহার সূচনা করিয়া দিবে তাহা নিতান্তই ইতিহাস সঙ্গত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগরের সমাজে তখনই কর্মব্যস্ততা আসিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যস্ততা সমাজের উপরিতন স্তরের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। পলাশী যুদ্ধের অপরিমোঘ সন্ধ্যায় ইতিহাসের অদৃশ্য হস্ত যখন নূতন পটপরিবর্তনে নিযুক্ত ছিল—সেদিনও দেশের সর্বসাধারণ দিনের কর্ম অন্তে দাওয়ায় বসিয়া কীর্তন গান করিতেছিল—একথা বলিতে খুব বেশী ঐতিহাসিক কল্পনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারপরে পঞ্চাশ বৎসর না যাইতেই কলিকাতা সমাজ-

জীবনের নূতন কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই নূতন কেন্দ্রের আকর্ষণ হইল ব্যবসা বাণিজ্য। নূতন প্রয়োজন আত্মপ্রকাশের নূতন বাহন খুঁজিতে লাগিল। প্রয়োজনের তাগিদে বাঙলা গদ্য গড়িয়া উঠিল। প্রয়োজনের তাগিদেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা। খৃষ্ট-ধর্ম-প্রচার-রূপ প্রয়োজনের তাগিদেই কেরীর বাঙলা ভাষা শিখিবার ও লিখিবার চেষ্টা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ানী ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তকের চাহিদাতেই কলেজের মুন্সী ও পণ্ডিতগণের বাঙলা গ্রন্থ প্রণয়ন। আবার বেদান্ত প্রচার ও বাদানুবাদের তাগিদেই রামমোহনকে বাঙলা গদ্য লিখিতে হইল। তারপরে নূতন ধরণের পাঠ্য-পুস্তক রচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ায় বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙলা বই লিখিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রয়োজনাতিরিক্ত আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যে বোধ হয় সর্বপ্রথমে গদ্য লিখিবার কলম ধরিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' সর্বাংশে প্রয়োজনাতিরিক্ত রচনা নহে, কারণ সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন ভিতরে ভিতরে লেখকদিগকে খোঁচা মারিতেছিল। গদ্য প্রয়োজনের ফসল। সকল দেশেই প্রয়োজনের তাগিদে অনুবাদের সূত্রে গদ্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙলা দেশের বেলায় অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে নাই। তবে অপ্রত্যাশিতের মধ্যে এইটুকু যে প্রয়োজনের সময়ে হাতের কাছে জনকয়েক মনীষী ব্যক্তিকে বাঙলাদেশ পাইয়াছিল। কেরীর নিষ্ঠা, মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের স্বাভাবিক রচনা ক্ষমতা, রামমোহনের প্রতিভা ও বিদ্যাসাগরের শিল্পজ্ঞান জুটিয়া যাওয়াতে বাঙলা গদ্য অত্যল্পকালের মধ্যে ডবল প্রমোশন পাইয়া গেল।

উইলিয়ম কেরীর জীবন নিষ্ঠা ও আদর্শবাদে পূর্ণ। নিষ্ঠার ভাগ আর একটু বেশী হইলে তিনি ডন কুইকসট হইতেন, আদর্শবাদের ভাগ আর একটু কম হইলে তিনি তৎকালীন ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীদের দলবর্দ্ধন করিতে পারিতেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার চরিত্রে এই দুইটি গুণের এমন সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে খৃষ্টধর্ম প্রচারাকাঙ্ক্ষী উইলিয়ম কেরীকে বাঙলা গদ্যের জনক করিয়া তুলিয়াছিল।

কেরীর জীবন তিন ভাগে বিভক্ত।

১৭৬১ সালে তাঁহার জন্ম হইতে ১৭৯৩ সালে বাঙলাদেশে আগমন পর্য্যন্ত প্রথম জীবন। দরিদ্র পরিবারের সন্তান কেরী নিজের চেষ্টায় গ্রীক, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। তখনই তাঁহার মনে হিদেন বা অবিশ্বাসিগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের বাতিক পাইয়া বসে। সেই সূত্রে এবং সেই আশাতেই তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষে রওনা হন। ওদেশে থাকিতেই তিনি জুতা সেলাই শিখিয়াছিলেন। ভালই করিয়াছিলেন, নতুবা এদেশে আসিয়া বাঙলা গদ্যের মণ্ডপে তাঁহার চণ্ডীপাঠ ব্যাপার এমন করিয়া প্রবাদের পূর্ণাঙ্গতা পাইত কি?

কেরীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭৯৩ হইতে ১৮০১ সাল পর্য্যন্ত। এই সময়টাতে তিনি প্রথমে মালদহ জেলায় ও শেষের দিকে শ্রীরামপুরে ছিলেন। বাঙলা চর্চা, বাঙলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, বাঙলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এই সময়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

১৮০১ সালে কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩১ সালে পেন্সন লইয়া কেরী এই কাজ হইতে বিদায় লন। ১৮৩৪ সালে "৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় এবং বিশেষভাবে তৃতীয় অধ্যায়টিই বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

বর্তমান প্রসঙ্গে কেরীর জীবন, ধর্মপ্রচারে উৎসাহ, তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্য প্রভৃতি আলোচনার ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এমন কি বাঙলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত কীর্তি ও দাবীর আলোচনাও এখানে অনেক পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। বাঙলা উনবিংশ শতকের জীবন-তত্ত্ব বয়নে তাঁহার যেটুকু কৃতিত্ব, সঙ্গতভাবে কেবল তাহারই আলোচনা চলিতে পারে। বাঙলা গদ্য ইতিহাসের পুরোভাগে উইলিয়াম কেরীর নাম অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত দাবী অর্থাৎ প্রধান দাবী কি? প্রধানতঃ তিনি লেখক না সংগঠক। অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে গদ্য রচনায় তাঁহার প্রতিভা তাহার প্রকৃত ক্ষেত্র পাইয়াছে, না যাঁহারা গদ্য লিখিতে পারে বা পারিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া উৎসাহ দিয়া সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়া সমভাবের পরিমণ্ডলীযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র রচনা করিয়া দিয়া যে সুদক্ষ সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণতর পরিচয়? রচনার শক্তি সামান্য শক্তি নয়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রচনার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির শক্তিকেই বা কেন ন্যূন করিব? সৈন্য পরিচালনা করেন যে সেনাপতি তিনি কি সৈন্যদল সংগঠন-কারীর চেয়ে সত্যই বড়? ফরাসী বিপ্লবের সেনাপতিদের চেয়ে 'Organizer of Victory' Carnotকে কেহ তো ছোট বলে নাই। এমন কি যুবক নেপোলিয়ানের সামরিক প্রতিভার আবিষ্কারের সঙ্গেও তো Carnot-র নাম জড়িত। আমার বিশ্বাস রচনার প্রতিভা অপেক্ষা সংগঠনী প্রতিভাই উইলিয়ম কেরীর বেশী ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে নয়, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেই তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে বাঙলা গদ্যের জনক না বলিয়া যাঁহারা বাঙলা গদ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাঁহাদের জনকস্থানীয় বলাই উচিত। বাঙলা গদ্যের যিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই যে কেরীর আবিষ্কার! মাইকেলের ভাষায় কেরী বলিতে পারিতেন—ইহা কি আমাকে অমরত্ব দান করিবে না? অবশ্যই করিবে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরী অমর হইয়া রহিয়াছেন।

ডিরোজিও

বায়রন নামক একটি জলন্ত উল্কাপিণ্ড পৃথিবীকে অগ্নিচক্রে বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার সময়ে philistine-বাদের সহিত আহত হইয়া শত সহস্র খদ্যোতবর্ষী খণ্ডে ভাঙিয়া পৃথিবীর নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইসব খণ্ডের কয়েকটি বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে পুশকিন, হায়নে, দে মুসে প্রভৃতি নামে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বায়রনীয় উল্কার যে খণ্ডটি ইউরোপ হইতে সবচেয়ে দূরে ছিটকিয়া পড়িয়াছিল, সেই খণ্ডটির নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও; যেস্থানে পড়িয়াছিল, তাহার নাম বাঙলা দেশ। ডিরোজিও যে পুশকিন বা হায়নে বা দে মুসের চেয়ে অনেক নিম্নতরস্তরের কবি, ইহা সকলেই জানে; কিন্তু সকলের বিশেষভাবে জানা উচিত যে, ইঁহারা সকলেই সগোত্র কবি, সকলেই বায়রনীয় উল্কার ছোট বড় নানা আকারের টুকরা। মূল উল্কার সমস্ত গুণ ইঁহাদের চরিত্রে ছিল এবং সমস্ত দোষ—কবি-প্রতিভা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, মানব-প্রেম ও বিদ্রোহপরায়ণতা, রোমান্টিক দুর্ভাগ্য ও স্বল্পায়ু (সকলের ক্ষেত্রে নহে), অত্যুচ্চ আদর্শবাদ ও বিশেষ ধরণের নেকটাই, সব লক্ষণগুলিই ইহারা বায়রনের জীবন হইতে সযত্নে আহরণ করিয়া লইয়াছিল। ডিরোজিওর যে ছবিখানি বহুপ্রচলিত, তাহার সর্বাঙ্গে উৎকট বায়রনীয় ছাপ, চোখে-মুখে রোমান্টিক দুর্ভাগ্যের ভান। ভান বলিয়াই মিথ্যা মনে করি না, কারণ প্রত্যেক মানুষেই অল্পবিস্তর ভান করিয়া থাকে; আর যাহা সকলেই কখনও না কখনও করে, তাহা মিথ্যা বলি কি ভাবে? বায়রন ও তাঁহার কবিসহচরদের জীবনে ভান ও চপলতার তলে কোথাও একটা দৃঢ়তা ছিল, সেই দৃঢ়তার উপরেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা আর কিছুই নয়, বায়রনের মানবপ্রেম। মানবপ্রেম তাঁহার কাছে সত্য ছিল বলিয়াই সব দেশকেই তিনি আপন মনে করিতে পারিতেন। ইটালীও তাঁহার যেমন আপন, গ্রীসও তেমনি আপন; বরঞ্চ জন্মভূমি ইংলণ্ড যেন তত আপন নয়, তার কারণ ইংলণ্ডের ব্যক্তিমানবকে তিনি জানিতেন, ওইখানেই তাঁহার মানবপ্রেম বাধা পায়; বায়রনের মানবপ্রেম নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক। বায়রন ঘটনাচক্রে এদেশে আসিয়া পড়িলে ইটালী ও গ্রীসের ন্যায় ভারতবর্ষকেও আপন মনে করিতে পারিতেন। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এই দেশকেই আপন দেশ মনে করিতেন। এই বিদেশীয় ফিরিঙ্গিই প্রথম জাতীয় কবি। তাঁহারই কবিকণ্ঠে ভারতবর্ষ প্রথম মাতৃসম্বোধন ও স্বদেশ আখ্যা শুনিয়াছিল—শুনিয়াছিল তবে বুঝিতে পারিয়াছিল কি? ভাষাটা ছিল বৈদেশিক!

বাঙলাদেশের উনবিংশ শতকের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, সময়টাতে কিছু পরিমাণে 'melodrama'র মিলন ছিল। ইহাকে দোষ বলি না, কেননা melodrama হইতেছে 'melody ও drama'র মিশ্রণ, ইহাদের কোনটাই নিন্দনীয় নয়, আর চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সরলতা না

থাকিলে কেহ melodramatic হইতে সাহস পায় না। মাইকেল মেলোড্রামাটিক ছিলেন, কবিতার কলম ছাড়িলেই তিনি মেলোড্রামাটিক হইয়া পড়িতেন। 'আমার জীবন' লেখক নবীন সেন মেলোড্রামাটিক, সেকালের দেশী নামের বিদেশী বানান অনেক ক্ষেত্রেই মেলোড্রামাটিক; আমার কেমন যেন বিশ্বাস কেশব সেনের মধ্যেও মেলোড্রামার ভেজাল কিছু কিছু ছিল। এখন সেই সব মেলোড্রামা-মেখলার গুরু হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। তাঁহার জীবনকালীন ও জীবনোত্তর প্রভাব বুদ্ধিবৃত্ত আন্তরিকতার মতো এই গুণটিকেও সমাজে স্থায়িত্ব দিয়াছিল। কাজেই উনবিংশ শতকের সামাজিক ও শিক্ষার ইতিহাস লিখিতে যে ইচ্ছুক, এই ধারাটার অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে তাহাকে মৌলালির এই ফিরিঙ্গি যুবকের ড্রয়িংরুমে আসিয়া উপস্থিত হইতেই হইবে।

ডিরোজিও স্বল্পায়ু ছিলেন, ১৮০৯ সালে জন্ম, ১৮৩১এর ২৬শে ডিসেম্বর মৃত্যু। ১৮২৩ সালে তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। আর ১৮২৬ হইতে ১৮৩১ সাল এই পাঁচ বৎসর ছিলেন তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক। পাঁচ বৎসরকালই যথেষ্ট। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষায় ও সাহচর্য্যে ছাত্রসমাজে এমন আলোড়ন ঘটিয়া গেল যে, বাহিরের চাপে কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদায় লইতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু ঝড় থামিলেই তো ঢেউয়ের দোলা থামে না, হিন্দুসমাজ আন্দোলিত হইতেই থাকিল।

সেকালের লোকে হিন্দু কলেজকে খৃষ্টান কলেজ মনে করিত, তাহাদের ধারণা ছিল যে ওখানে ছেলেদের খৃষ্টান হইবার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেওয়া হয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, হিন্দু কলেজের হাওয়া কোন ধর্মের পক্ষেই অনুকূল ছিল না। ওখানকার ইংরাজ অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাববান দুইজনে—ডিরোজিও ও রিচার্ডসন ধর্মের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা সন্দেহবাদী ছিলেন। ডেবিড হেয়ার সেকালের শিক্ষা জগতের স্বপ্রতিষ্ঠ প্রাণস্বরূপ—তিনি নাস্তিক ছিলেন। তাঁহার স্কুলের জনকয়েক ছাত্র একবার কোন পাদ্রীর নিকট হইতে বাইবেল উপহার লইয়াছিল জানিতে পারিয়া হেয়ার সাহেব তাহাদিগকে আচ্ছা করিয়া বেত মারিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। অবশ্য হিন্দু কলেজের কোন কোন নামকরা ছাত্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু তাহা হিন্দু কলেজের প্রভাবে নয়, হিন্দু কলেজের প্রভাব সত্ত্বেও। মাইকেল যখন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, তখন অনেককাল ডিরোজিওর মৃত্যু হইয়াছে, এমন কি তৎপূর্ব বৎসর ১৮৪২-এ হেয়ার সাহেবও দেহত্যাগ করিয়াছেন। মাইকেলের ধর্মান্তরণের দায়িত্ব হিন্দু কলেজের ঘাড়ে চাপানো চলে না। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩২-এ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তার আগেই ডিরোজিওর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এই সব দীক্ষা হইতেও প্রমাণ হয় না যে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতগণের বিশ্বাস ছিল। পরবর্তীকালের গোঁড়া খৃষ্টান পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন—"হিন্দুধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মতো খৃষ্টধর্মের বিরোধিতাও অনুরূপ স্পষ্ট ছিল। এই কাহিনীর বিষয়বস্তু (অর্থাৎ কৃষ্ণমোহন) কয়েক রাত্রি বহু বন্ধু সমভিব্যাহারে কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—গসপেল বা

যীশুর বাণী প্রচারের ভাণ করিয়া বাঙলা ভুল উচ্চারণ এবং বাঙলাভাষার শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ অনুকরণ করিয়া মিশনারিদের লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।"

হিন্দুসমাজের এই সব সন্দেহবাদী ছাত্র ও শিক্ষকের নিকটে সকল ধর্মই সমান অসার ছিল, কাজেই এক ধর্ম হইতে ধর্মান্তর গমনে তাঁহারা ব্যথা পাইতেন না। কিন্তু দুই-ই যখন সমান অসার ছিল, তখন ধর্মান্তরিত হইবার প্রয়োজনটা কি? ধর্মাচরণের প্রয়োজন না হইলেও অন্য প্রয়োজন তো থাকিতে পারে। মাইকেল বৈষয়িক উন্নতির আশায় খৃষ্টান হইয়াছিলেন। সেকালের অনেকেই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার সুবিধা পাইবার জন্য ধর্মান্তর লইতেন। পরবর্তী জীবনে কেহ যদি ধর্মে সত্যই বিশ্বাসী হইয়া থাকে তাহাতে ধর্মান্তর গ্রহণকালের বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে না। বিশুদ্ধ ব্যাকুলতায় কেহ কদাচিৎ ধর্মান্তর লইয়া থাকে। ধর্ম সম্পদের হেতু।

সমাজবিরুদ্ধ আন্দোলনের হেতু মনে করিয়া ডিরোজিওকে যখন কলেজ হইতে সরাইবার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেন, নানা কারণে, তাহা উল্লেখযোগ্য হইলেও আমাদের উক্তিই প্রমাণিত হইবে যে ডিরোজিও নাস্তিক ছিলেন না, সন্দেহবাদী ছিলেন। নাস্তিক্যও একপ্রকার গোঁড়ামি। গোঁড়ামি মানে কোন বিশ্বাসের সহিত শৃঙ্খলিত থাকা। কিন্তু চাইলড হ্যারল্ড ও ডনজুয়ান তো কোথাও স্থিতি পাইবার জন্য জন্মে নাই, সর্গ হইতে সর্গান্তরে তাহারা অকারণে ভাসিয়া বেড়াইবে। বায়রন তো কোথাও কায়েমী হইয়া বসিতে পারে না। ইংলণ্ড হইতে তুর্কী, তুর্কী হইতে ইংলণ্ড, ইংলণ্ড হইতে আবার ইটালী ও গ্রীস যতক্ষণ না মিশলঙ্ঘির ম্যালেরিয়া যবনিকা টানিয়া দিতেছে, ততদিন এই অকারণ ভ্রাম্যমাণতার আর অবসান নাই। নিজের সন্দেহবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিও লিখিতেছেন—"মহাশয়, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতের অহরহ পরিবর্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও আমি কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এরূপ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে, কোনরূপ গোঁড়ামি করিবার সাহসই আমার নাই। কাজেই আমি কখনই এমন কথা বলিতে পারি না, 'এটা ঠিক আর এটা ঠিক নয়।' বিজ্ঞানের বিবিধ গবেষণা ও মনীষিগণের চিন্তার ফলে ইহাই বুঝা গিয়াছে যে, বিনয়ই সর্বোচ্চ জ্ঞান, আর সর্বোচ্চ জ্ঞানই আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞতার কথা নিশ্চয় স্মরণ করাইয়া দেয়।"

ইহার পরে ডিরোজিওকে আর নাস্তিক বলা চলে না, কিন্তু সন্দেহবাদ যে নাস্তিক্যের চেয়েও মারাত্মক! নাস্তিকের ভগবানের উপরে অবিশ্বাস জন্মে, আর সন্দেহবাদের ফলে যে জগৎটাই মিথ্যা হইয়া যাইবার আশঙ্কা। নাস্তিক্য অন্ধকার, সন্দেহবাদ কুয়াসা; অন্ধকারে নক্ষত্র আছে, সন্দেহবাদে নিজের অস্তিত্ব অবধি লোপ পায়। উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষিগণের মধ্যে নিরীশ্বর সন্দেহবাদিতার একটা ক্ষীণ ধারা বর্তমান। খুব সম্ভব এ প্রবাহটিরও উৎস এই যুবক কবির চিত্ত! উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের ইতিহাসে ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বের দুইটা চিহ্ন পাওয়া গেল। আরও আছে।

আগেও বলিয়াছি, আবার বলি ডিরোজিও আমাদের প্রথম জাতীয় কবি। তাঁহার আগে আর কোন কবি ভারতভূমিকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন কিনা, এদেশকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, জানি না। কিন্তু এত জানিবার প্রয়োজনই বা কি ? বায়রনীয় চৈতন্যের নিকটে সব দেশই স্বদেশ, কাজেই এই বিদেশী ফিরিঙ্গী কবি যে এদেশকে স্বদেশ করিয়া লইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? ডিরোজিও'র 'ফকির অব্ জঙ্গিরা'র ভারত সম্বোধন কবিতাটি এদেশের তাবৎ দেশাত্মক কবিতার প্রাণসূচী। তবে বিস্ময়ের কারণ একেবারে নাই, এমন হইতে পারে না। আমাদের প্রথম জাতীয় কবিকে আমরা সর্বতোভাবে ভুলিয়া বসিয়া আছি—এমন কি তাঁহার জন্মনগরী কলিকাতার একটি পথকেও তাঁহার নামে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ইহাতে জাতীয়তার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণার একটি পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার রাজপথ বাঙালীর কীর্তি, অপকীর্তি ও বিস্মৃতির রামায়ণ।

ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন তৎকালীন হিন্দু কলেজের সবচেয়ে প্রভাববান দুইজন অধ্যাপক, তবে তাঁহারা এক সময়ে তথাকার অধ্যাপক ছিলেন না। ডিরোজিওর কলেজত্যাগ ও মৃত্যুর চার পাঁচ বৎসর পরে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তথাপি যে তাঁহাদের দুইজনকে প্রায় সমসাময়িকভাবে তুলনা করা হয়, তার কারণ ডিরোজিওর প্রভাব তাঁহাকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইঁহারা দুইজনে সবদিক দিয়াই ভিন্ন ছিলেন—ডিরোজিও স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয়দাতা, রাজনীতিতে তিনি উদারপন্থী, রিচার্ডসন স্বাধীন চিন্তা পছন্দ করিতেন না, তিনি মানসিক টোরি, বিদ্রোহী ছাত্রদের তিনি দলপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামে চক্রবর্তী ফ্যাকশন বলিয়া ডাকিতেন; ডিরোজিওর প্রধান অস্ত্র ছিল শাণিত বুদ্ধি। রিচার্ডসনের অস্ত্র কোমল হৃদয়াবেগ, ডিরোজিওর প্রধান রতি দর্শনে, রিচার্ডসনের সাহিত্যে, তাঁহার সেক্সপীয়র আবৃত্তি নাকি অতুলনীয় ছিল, যুবক ডিরোজিও ছাত্রদের বান্ধব ছিলেন, রিচার্ডসন দূরে থাকিয়া আকর্ষণ করিতেন, কিন্তু দু'জনই স্বতন্ত্রভাবে তখনকার ছাত্রসমাজকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রিচার্ডসন-বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল মাইকেল মধুসূদন, আর ডিরোজিও-বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল—কাহার নাম করিব ? টেকচাঁদ ঠাকুর কি ? পরবর্তীকালে একবার টেকচাঁদ ঠাকুর ও মাইকেল মধুসূদনে তর্ক উঠিয়াছিল, কাহার প্রবর্তিত রীতি বাঙলা সাহিত্যে থাকিবে টেকচাঁদের আটপৌরে গদ্য না মধুসূদনের রাজকীয় পদ্য ? আজ দেখিতেছি, দুটাই রহিয়া গিয়াছে রূপান্তরে ; ইঁহাদের দুই গুরুর প্রভাবও কি রহিয়া যায় নাই সূক্ষ্মদেহে ? তবে ডিরোজিওরই বোধ করি জিত। কারণ তাঁহার শিক্ষা সমাজদ্রোহী বালখিল্য রাবণের দলকে সৃষ্টি না করিলে মাইকেল কি মেঘনাদ-বধ কাব্যের রাবণের কল্পনা করিতে পারিতেন ? সেকালের গোলদীঘিই মাইকেলের স্বর্ণলঙ্কার আদিরূপ, ডিরোজিও বীজাকারে মেঘনাদবধের রাবণ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

বাংলা সাহিত্যের ভূখণ্ড দুইটি বিচিত্র প্রবাহের দ্বারা বেষ্টিত। অপর নামের অভাবে একটি প্রবাহকে বলা হয় সাধু ভাষা, অপরটিকে কথ্য ভাষা। নাম দুটি ভাষার স্বরূপ প্রকাশক নয়, কারণ সাধু ভাষার সাধুত্ব যে কি বস্তু তাহা কেহ জানে না, আর কথ্য ভাষা বলিয়া যাহা আখ্যাত সে ভাষায় কোন বাঙালী এ পর্য্যন্ত কথা বলে নাই। সাধু ভাষা যদি কৃত্রিম অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে কথ্য ভাষাও সমান কৃত্রিম, দুই-ই সমান হাতে গড়া, শিল্পীর হাতে গড়া। নাগরিক শিল্পী সাধু ভাষার স্রষ্টা, কথ্য ভাষারও স্রষ্টা নাগরিক শিল্পী, কিন্তু সে যে নাগরিক নয়, নিতান্ত গ্রাম্য—এই ভানটুকু কথ্যভাষার মধ্যে নিহিত বলিয়া সাধু ভাষার তুলনায় কথ্য ভাষা অধিকতর কৃত্রিম।

আবার কোন কোন লেখক এই দুই ভাষাকে বঙ্কিমী ও রাবীন্দ্রিক ভাষা বলিয়া থাকেন। একজন লেখক বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত কথ্য ভাষা লিখিবার আগে অবধি বঙ্কিমী ভাষায় লিখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার গোরা উপন্যাসখানিও তাহা হইলে বঙ্কিমী ভাষার নিদর্শন, জীবনস্মৃতিও তাই; ঘরে-বাইরে কথ্য ভাষায় পৌঁছিয়া তিনি রাবীন্দ্রিক স্টাইলে কূল পাইলেন। প্রৌঢ়ের এই সব বালকোচিত উক্তিকে লঘুভাবেই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ছাপার অক্ষরের ছদ্মবেশ ভেদ করা সকলের পক্ষে সহজ নয়; কালো কালো অক্ষর এমন উদার ভাবে তাকাইয়া থাকে, যেন তাহা সক্রেটিস বা গৌতমবুদ্ধের চোখ—সত্য ঠিকরিয়া পড়িতেছে। পাঠকের পক্ষে ভুল করা অসম্ভব নয়, তাই প্রতিবাদ না করিয়াও একবার উল্লেখ করিতে হইল।

বস্তুতঃ সাধু ভাষা ও কথ্য ভাষা বিবর্তনের ধাক্কায় আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহাতে ক্রিয়াপদের প্রভেদটি মাত্র বজায় আছে, অন্বয়ে ও শব্দ-বৈচিত্র্যের কোন পার্থক্য আর নাই বলিলেও চলে। এখন দাঁড়াইয়াছে 'করিয়া' সাধু ভাষার চিহ্ন, আর 'করে' কথ্য ভাষার চিহ্ন—সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—'ইয়া' ভাষা এবং 'এ' ভাষা। আর কোন লক্ষণাক্রান্ত নাম পাওয়া কঠিন।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে সংশয় থাকে না যে, ভাষার এই দুই প্রবাহ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে চলিয়াছে, দুইয়ের মৌলিক দূরত্ব অনেকটা ঘুচিয়া আসিয়াছে, দুইয়ের মৌলিক পার্থক্যও আজ আর নাই—তবু আজিও দুইয়ের সঙ্গম ঘটিয়া ওঠে নাই—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সত্ত্বেও ঘটিয়া ওঠে নাই, রবীন্দ্রনাথ ইহাদের মিলনের পথের শেষ বাধা দূর করিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গদ্য সাধু ভাষা না কথ্য ভাষা? তাঁহার ভাষাকে সাধু ও কথ্যের মিশ্রণ বলা উচিত, তাহা 'ইয়া+এ' ভাষা। তাঁহার ভাষাতে সাধু ভাষার শব্দাবলীর

সহিত কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদ যুক্ত। তিনি গদ্যে ও পদ্যে যত সংস্কৃত শব্দ, উপমা, অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন, কোন সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তত করেন নাই, করিতে সাহস পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনও ততদূর অগ্রসর হন নাই। সংস্কৃতের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার লুঠ করিয়া তিনি কথ্য ভাষার গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া দিয়া বাড়িতে আনিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত দুই ভাষার মিলনের ইহাই নিকটতম স্থান। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী যে ভাবে সাধু, সীতারাম সে ভাবে সাধু নয়, আবার প্রবন্ধাবলীর সাধুত্ব আরও ফিকা। দেবীচৌধুরাণীর 'ইয়া' ভাষার সহিত মাঝে মাঝে 'এ' ভাষার মিশ্রণ আছে; অনবধানবশতঃ নয়, দুই ভাষা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আবার বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের সাধুত্ব তাঁহার অসমাপ্ত আত্মচরিতের সাধুত্ব হইতে ভিন্ন। আত্মচরিতের 'ইয়া'কে 'এ' করিয়া দিলেই তাহাকে ঘোরতর কথ্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। বাঙালীর মতোই বাঙলা সাহিত্যেরও যাহা কিছু সমস্যা ক্রিয়াকে লইয়া, কাজের বেলায় বাঙালী অক্রিয় হইলেও ভাষার বেলায় শুধু সক্রিয় নহে, একেবারে দ্বিক্রিয়।

এই দুই ভাষার কোন কালে মিলন সম্ভব, কারণ এককালে একই উৎস হইতে এ দুইয়ের উদ্ভব—সে উৎস মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহিত্যবোধ। গঙ্গা ও যমুনার ধারাকে যে ব্যক্তি মধ্য পথে দেখিয়াছে, সে কেমন করিয়া জানিবে যে, প্রয়াগে ইহাদের সঙ্গম? আবার যে-ব্যক্তি ইহাদের যুক্তবেণী রচনা দেখিল সেই বা কেমন করিয়া জানিবে যে হিমালয়ের নির্জনতায় তপস্যার তুষারাসনে বসিয়া ভারতলক্ষ্মী কবরী খুলিয়া এই বেণী দুটিকে শিথিল করিয়া দিয়াছেন? যাহাদের উদ্ভবের উৎস এক তাহাদের মিলনের সঙ্গমও এক হওয়াই সম্ভব।

"যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন, সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে-সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কারধারীরা বসিতেন, সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল।" ইহা যদি সাধু ভাষার নমুনা হয়, তবে নীচের অংশ কথ্য ভাষার নমুনা—

"ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি মরিব। তৎ-পত্নী কহিল মরুকম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় দেখি দেখি হাঁড়ি কুঁড়ি খুদ কুড়া যদি কিছু থাকে।" ক্রিয়ার ইয়া সত্ত্বেও, 'তৎপত্নী' সত্ত্বেও এই ভাষা কথ্য ভাষা রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের ভাষার আদিতম রূপ, বা প্রথম উদাহরণটি যেমন বিদ্যাসাগরীয়, বঙ্কিমচন্দ্রীয় ভাষার পূর্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্ম ১৭৬২ সালে, মেদিনীপুর জেলায়। মেদিনীপুর জেলা তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কৈশোরে নাটোরের রাজার সভাপণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। তারপর ১৮০১ সালে কেরি সাহেবের সুপারিশে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কাজ ১৫ বৎসর করিবার পরে আর উন্নতির আশা নাই বুঝিয়া সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮১৯ সালে তীর্থযাত্রা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে মুর্শিদাবাদের নিকটে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন, বাগবাজারে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল, সেখানে তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। সে কালের পক্ষে তাঁহার বুদ্ধি উদার ছিল, সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি পাঁতি দিয়াছিলেন, আবার নানারূপ লোকহিতকর কার্য্যের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। কিন্তু ইহাদের কোনটিই তাঁহাকে অমরতা দান করিতে পারিত না। তৎকালীন বাঙলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন। বাঙলা ভাষার ভিত্তির প্রথম ইট ক'খানা তাঁহার বলিষ্ঠ বাহু এমন সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল যে, পরবর্তী লেখকগণকে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনো চিন্তা করিতেও হয় নাই। নড়া দাঁতটাই বারবার মনে পড়িয়া যায়, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্তি এমন অনড় ছিল যে, তাহার সম্বন্ধে কাহারো মনে প্রশ্ন জাগিবারও অবকাশ পায় নাই। নিজের কীর্তির নিশ্চয়তাই মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ভুলাইয়া দিয়াছে।

একজন সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের আকৃতি, প্রকৃতি ও পাণ্ডিত্যের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ডক্টর জনসনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের জনসনকে মনে পড়িয়া গিয়াছে। দুটি তুলনার মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে। পাণ্ডিত্য বা প্রতিভা জনসনের প্রধান ঐশ্বর্য্য নয়, চরিত্রই তাঁহার বিশিষ্ট সম্পদ্। চরিত্র-মাহাত্ম্যেই তিনি তৎকালীন শিল্পী সমাজে বিক্রমাদিত্যের আসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চরিত্রবলে মৃত্যুঞ্জয় জনসনের সমকক্ষ ছিলেন কি না জানি না এবং মার্শম্যান জনসনকে দেখিয়াছিলেন কি না তাহাও জানি না, তৎসত্ত্বেও সাক্ষী হিসাবে তাঁহার উক্তির মূল্য স্বীকার করিতে হয়। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন, পরিত্যক্ত একটি পাড়ার সিক্ত স্নিগ্ধ অন্ধকার গলিপথে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত তাঁহার বিপুলায়তন দেহ-ভার টানিয়া লইয়া মৃদুগতিতে চলিয়াছেন, পায়ে তাঁহার চটি, হাতে বাঁকা লাঠি, মাথায় শিখা-গুচ্ছ আর মোটা চাদর ভাঁজে ভাঁজে মেদবহুল অর্দ্ধনমিত উদরের খাঁজে খাঁজে মিলিয়া গিয়াছে, দৃশ্যটি যুগপৎ কৌতূহল ও কৌতুকজনক। তাঁহার বিপুল দেহ, বিপুলতর পাণ্ডিত্য এবং গুরু-গম্ভীর ভাষার পটভূমিতে গ্রাম্য ভাষা ও হাস্যরস এক প্রকার চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে—ঐখানেই তাঁহার বৈচিত্র্য। স্থূলদেহে সূক্ষ্মবুদ্ধি মানুষকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। স্থূলকায় গণেশ সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে সিদ্ধিদাতা বলিয়া কথিত। স্থূলোদর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আমাদের বাঙলা সাহিত্যের গণপতি। তাঁহার স্থান সর্বাগ্রে। তাঁহার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী লেখক বাঙলা-দেশে অনেক আছেন; কিন্তু নমো গণেশায় বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে স্মরণ করিয়া আরম্ভ করা ছাড়া কাহারো পক্ষে গত্যন্তর নাই।

রামরাম বসু

ইতিহাস কাহাকে মনে রাখে? তাহার সোনার তরীতে স্থান সঙ্কীর্ণ কাজেই সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া তাহাকে যাত্রী তুলিতে হয়। এই বিচারে কে বাদ পড়ে? ধনী, মানী, যে ব্যক্তি জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যলাভের দুর্ভাগ্যে ভারাক্রান্ত তাহাদের স্থান ইতিহাসের নৌকায় হয় না। মহৎ কর্মে যাহারা ব্যর্থ হইয়াছে ইতিহাস তাহাদের সাদরে গ্রহণ করে। আবার যাহাদের জীবনে রহস্যের ছায়ালোক জড়িত, যাহাদের জীবনের কালো মেঘমালাকে জড়াইয়া প্রতিভার চপল হাসি চিকমিক করিতেছে, সংসারের কাজে তাহারা গৌণপাত্র হইলেও ইতিহাসের বজরার এককোণে তাহাদের স্থান হইয়া থাকে। এ বিচার বিচিত্র কিন্তু কি করিবে বলো, বৈচিত্র্যই যে ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ, তাই সে নিরেট সোনার তাল ফেলিয়া তিল প্রমাণ সোনার ধূলিকণা সংগ্রহ করে। কেবল নিউটন নয়, ইতিহাসের রসিক পুরুষও জ্ঞানসমুদ্রতীরের নুড়ি কুড়াইয়া থাকে।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক মহারথীর সঙ্গে নিতান্ত পদাতিক রামরাম বসুর স্থান হইয়াছে। কিন্তু কোন্ বিচারের মাপকাঠিতে? তাঁহার রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। ইহা সামান্য সাফল্য নয়, এক হিসাবে সফলতার চরম। যে সুদীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অমর গ্রন্থমালার নাম, একেবারে তাহাদের শিরোনামায় ধূর্জটির ললাটে চাঁদের চন্দ্রবিন্দুটির মতো রামরাম বসু রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের স্থান। প্রথমের প্রতি ইতিহাসের লোভ থাকিলেও সে লোভ দুর্জয় নহে, অনেক প্রথমকে ভুলিতে পারিলে তবেই অনেক প্রধানকে গ্রহণ করিবার স্থান হয়। ওদিকের বিচারে রামরাম বসুর স্মরণীয় হইবার আশা অল্প, তবু তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কোন্ গৌরবে? সত্য কথা বলিতে হইলে বলা উচিত যে, গৌরবের অভাবই প্রায়ই স্মৃতিযোগ্য করিয়া রাখে। লোহার তাল আপনার গৌরবে ডুবিয়া যায়, লঘু পদ্মের পাপড়ি ভাসিয়া থাকে। রামরাম বসুর জীবনে এমনি একটি লঘুতা ছিল, রহস্যময় লঘুতা, একটি Impishness. টমাস, কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণের মনে সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর তিনি অচিরে খৃষ্টান হইবেন এই আশা জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। খৃষ্টান না হইয়াও তিনি খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক ছিলেন, খৃষ্ট-ভজন রচনা করিয়াছিলেন, 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' নামে খৃষ্টচরিত লিখিয়াছিলেন, আর মিশনারিগণের কাজের পক্ষে নিজেকে এমনি অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, গর্হিত আচরণের জন্য পদচ্যুত হইয়াও আবার স্বপদে ও স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙলা বিভাগের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হইয়া জীবন শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও কেরির উপরে

তাঁহার প্রভাব কার্য্যকর ছিল, ৭ই আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হইল, ৮ই আগষ্ট তাহার পুত্র পিতার স্থলে কলেজের বাঙলা বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সব কার্য্যকলাপ হইতে মনে হয় যে রামরাম বসু অতিশয় দক্ষ, অতিশয় চতুর, সুগভীর, লোকচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞানের প্রকাণ্ড মহীরুহ বলা চলে। এই সব গুণের তুলনায় তাঁহার বাঙলা রচনার ক্ষমতা নিতান্ত তুচ্ছ। কেরির আদেশ পাইলে অর্থাৎ সাংসারিক লাভের আশা আছে জানিলে তিনি হিব্রুভাষাতেও বই লিখিতে পারিতেন। তাঁহার লোকচরিত্রজ্ঞান যেমন প্রবল ছিল, মিশনারিগণের সে জ্ঞান তেমনি ভোঁতা ছিল—এই মণিকাঞ্চনের সমাবেশ ঘটাতেই রামরাম বসু ছাব্বিশ বৎসরকাল মিশনারিদের অর্থে জীবনযাপন করিয়াও খৃষ্টান হন নাই—অথচ তাহাদের আশাও মরিতে দেন নাই। আশা দুর্মর! রামরাম বসু একটি দুর্লভ নাটকীয় চরিত্র, ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া সেকালের আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বাঙালী নাট্যকার ইচ্ছা করিলে মনোজ্ঞ প্রহসন লিখিতে পারেন। বসুজার ছবি আমার চোখে পড়ে নাই, তবে কেমন যেন মনে হয়, লোকটি কৃশ ছিল, মাথার চুল ঈষৎ কুঞ্চিত, ছোট চোখ দুটি সদাসর্বদা মিটমিট করিত, কপালে অনেকগুলি রেখা, গায়ে সেকালের হাত-আঁটা পিরান, তার উপরে উড়ুনি, পায়ে পালিশকরা বুক-আঁটা চীনের জুতো, মাথায় শাদা ফেটা, হাতে খ্রীষ্ট বিবরণামৃতের পাণ্ডুলিপি—বসু মহাশয় খৃষ্টতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে মিঃ কেরির বাসায় চলিয়াছেন। বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কেরির প্রদত্ত রূপার ক্রুশ চিহ্নটি জেব হইতে বাহির করিয়া গলায় পরিয়া লইলেন। অবশ্য, এ চিত্র ঐতিহাসিক নয়, নিতান্তই আমার মনগড়া, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ পড়িয়া ওই একখানি চিত্রই যে মনে উদিত হয়।

রামরাম বসুর জন্ম ১৭৫৭ সালে—মৃত্যুর সাল ১৮১৩।

১৭৮৭ সালে তিনি মিশনারি জন টমাসের বাঙলা শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। টমাসের সঙ্গে তিনি মালদহে গিয়া তাঁহাকে বাঙলা শিখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে টমাসের ধারণা হয় যে, কালক্রমে বসু ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে, তার কারণও ছিল। ১৭৮৮ সালে বসু টমাসকে জানান যে, তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে প্রভু যীশু তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন—এই বলিয়া স্বরচিত একটি খৃষ্ট-মহিমা গান প্রদর্শন করেন—

"কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজছ্ ক্রাইষ্ট বিনা গো।
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজছ্ ক্রাইষ্ট বিনা গো"—ইত্যাদি।

একে যীশুর দর্শন তারপরে যীশুবন্দনা রচনা, তার উপরে কথাবার্তায় Gospel সম্বন্ধে তাহার ভক্তি ও জ্ঞান দেখিয়া টমাসের স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে আর বিলম্ব নাই। টমাসের অন্তঃকরণ সরল ছিল, সরলান্তঃকরণ না হইলে পালের জাহাজের দিনে সাত হাজার মাইল দূরে কেহ খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করিতে আসে না!

১৭৯২ সালে টমাস ইংলণ্ড রওনা হন। ১৭৯৩ সালে যখন তিনি ফিরিলেন সঙ্গে আসিলেন কেরি। সেই সালেই কুড়ি টাকা বেতনে বসু কেরির মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। টমাস একটা সংবাদ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মুন্সীজি কুসংস্কারে আবার ডুব দিয়াছিলেন। অবশ্য স্বধর্মী ও স্ব-সমাজের অত্যাচারই নাকি তাহার একমাত্র কারণ —টমাসকে কেরি এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল। যাই হোক অনুতপ্ত বসু কেরির মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। নানাস্থান ঘুরিয়া ১৭৯৪ সালে তিনি কেরির সঙ্গে মালদহের অন্তর্গত মদনাবাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭৯৬ সালে এমন একটি ব্যাপার ঘটিল যাহাতে রামরাম বসুকে ত্যাগ করিতে কেরি বাধ্য হইলেন। রামরাম বসু একটি তরুণী বিধবার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—এবং এই বিধবার একটি সন্তান হওয়াতে শিশুটিকে গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন। মিশনারিগণ Gospel-এর সম্মান রক্ষার্থ মনঃকষ্ট সত্ত্বেও রামরাম বসুকে ত্যাগ করিল। ইহার পরে কয়েক বৎসর বসুর সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮০০ সালে কেরি শ্রীরামপুর আসিয়া পৌঁছিলে বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রামরাম বসুর মতো গুণী লোকের সাহায্য না পাইলে ধর্মপ্রচার সম্ভব নয় জানিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। অতঃপর কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলে তাঁহার অধীনে বসু ৪০৲টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও লিপিমালা তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ।

এইত হইল রামরাম বসুর ব্যক্তিগত চরিত্র ও কীর্তি। কিন্তু উনবিংশ শতকের সামাজিক মানচিত্রে তাঁহার স্থান কোথায়? অষ্টাদশ শতকের শেষদিক্ এবং উনবিংশ শতকে ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের সময় অবধি আমাদের সমাজজীবনে মিশনারিপর্ব। এদেশে খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু একজন মিশনারির ১৭৮৭ সালে লিখিত একখানি চিঠি হইতে জানিতে পারা যায় যে, "Out of ten million natives, we know of no Christian." ১৮০০ সালে কৃষ্ণ পাল নামে এক ছুতার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার টানে সর্বপ্রথম বাঙালীদের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে। কথিত আছে যে, তাহাকে ধর্মান্তরিত করিবার আনন্দে পাদ্রী মহাশয় রাতারাতি উন্মাদ হইয়া গিয়াছিল, দিব্যোন্মাদ নয়, একেবারে বদ্ধোন্মাদ। ১৭৮৭ হইতে ১৮০০ সাল এই তেরো বৎসরে একজন মাত্রের ধর্মান্তর গ্রহণ খুব আশাপ্রদ রেকর্ড নয়। এমন যে হইয়াছিল তার প্রধান কারণ মিশনারিগণ ভুল দিক হইতে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। কেরি, মার্শম্যানের সময় ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের পূর্ববর্তী। আর ইংরাজ রাজশক্তি পাদ্রীগণের সহায়তা না করা অবধি তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেরি, মার্শম্যান, টমাস প্রভৃতিকে সরকারী শক্তির প্রতিকূলে কাজ করিতে হইয়াছিল, সেই কারণেই তাহারা ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ধর্মান্তর গ্রহণেচ্ছু মধুসূদনকে লাটপাদ্রী এবং লাটের ফৌজ রক্ষা করিয়াছিল। এমন ঘটনা কেরি প্রভৃতির কল্পনাতীত ছিল। প্রথম আমলের পাদ্রীরা আন্তরিকতার দ্বারা যাহা করিতে পারে নাই

পরবর্তী কালের বিজ্ঞতর পাদ্রীর দল ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি মোহের অস্তরটিপুনির দ্বারা অনায়াসে তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বিশুদ্ধ ধর্মোন্মাদনায় কদাচিৎ কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করে।

পরবর্তী আমলের ধর্মান্তরিত বাঙালীদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া যদি মধুসূদন ও কৃষ্ণমোহনকে গ্রহণ করা যায়, তবে পূর্ববর্তী আমলের প্রতিনিধি বলিয়া রামরাম বসুকে লওয়া যাইতে পারে। বসু যে খৃষ্টান হন নাই তাহার প্রধান কারণ ইংরাজি শিক্ষা তাঁহার মন ও তাঁহার সমাজকে নাড়া দেয় নাই ; নদীর স্রোতে বেতগাছটার মতো তিনি নড়িয়াছিলেন বটে কিন্তু স্থানচ্যুত হন নাই। আমার তো বিশ্বাস তাঁহার Gospel-এর জ্ঞান, খৃষ্টভক্তি, মিশনারিগণের প্রতি বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব সমস্তই ছাব্বিশ বৎসর দীর্ঘ সুচতুর একটা ধাপ্পা। তৎকালীন উদ্যমী লোকেরা যে মনোভাব লইয়া সদাগরী আফিসে বা, কোম্পানীর কুঠিতে ঢুকিত রামরাম বসুও তদ্রূপ মনোভাবেই পাদ্রীদের সঙ্গে জুটিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার রচিত লিপিমালার একটি বাক্য পড়িয়া অনেকে মনে করেন, তিনি "রামমোহনের পূর্বেই পৌত্তলিকতা হইতে ব্রহ্মোপাসনার দিকে ফিরিয়াছিলেন।" ইহাও কেরি, টমাসের অনুরূপ একটি ভ্রম। তিনি ব্রহ্মোপাসনা, খৃষ্টোপাসনা কোন ভ্রমেই পড়েন নাই, বুঝিতেন সবই কিন্তু সেই আন্তরিকতা ছিল না যাহাতে কোন একটাকে প্রাণপণে গ্রহণ করিতে পারেন। এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার না ঘটিলে, পাদ্রীদের ভাগ্যে সরকারী সাহায্য না জুটিলে, খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের যে অবস্থা হইত, খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুকূল ব্যক্তিদের যে মনোভাব হইত, রামরাম বসু তাহারই প্রতীক। এইদিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে তাঁহাকে স্থান দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে বড় অধিকার তাঁহার বিচিত্র চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জীবন্ত অধিকার।



প্রিন্স টারাগোনা



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



ডিরোজিও



রাধাকান্ত দেব

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহর্ষি' সংজ্ঞাতে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না, কেন না, মহর্ষি বলিতে ঋষিত্বের গুণের পরিমাণমাত্র বোঝায়, তদতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু ঋষিত্বের অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ চরিত্রে থাকিলে তাহার প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় সংজ্ঞার আবশ্যক। ঋষিত্ব ব্যতীত অন্য অনেক গুণ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিল, সে-সব গুণ ঋষিত্বের প্রতিকূল নয়। কিম্বা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল হইলেও দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভায় একটা সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সংসারত্যাগী পুরুষ ছিলেন না; তিনি সংসারী ছিলেন, বিষয়ানুরাগী না হইয়াও বিষয়-বিচক্ষণ ছিলেন, গৃহী পুরুষ ছিলেন; আর তিনি যে সাধুপুরুষ ছিলেন, ভগবৎ-জানিত ধ্যানরসিক ছিলেন, তাহার উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। গৃহী এবং ধ্যানী, সংসারী এবং সাধু; বিষয়ী এবং বিবিক্ত—এই আপাতবিরোধের সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে ঘটিয়াছিল, এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এমন যে ঘটিতে পারিয়াছিল অবশ্যই তাহার কারণ আছে, কতকটা রামমোহনের দৃষ্টান্তে, কতকটা স্বকীয় প্রকৃতির ইঙ্গিতে, কতকটা বা উপনিষদের সেই উড়িয়া আসা ছিন্নপত্রের শ্লোকটির প্রভাবে। কিম্বা তাঁহার ব্যক্তিত্ব অন্ধভাবে যে-ধারাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, উপনিষদের শ্লোকটি উড়িয়া আসিয়া তাহার সমর্থন জানাইয়া গেল। আমাদের দেশের শাস্ত্রে গৃহ এবং সাধুজীবন পৃথক্ কুঠুরিতে বিভক্ত নয়; কিন্তু শাস্ত্রে যেমন নির্দেশই থাকুক না কেন, লোকমন এ দুইকে পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। আমাদের দেশের লোকোত্তর সাধুপুরুষগণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ সকলেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহাদের শিক্ষার প্রকৃত মর্ম না বুঝিবার ফলে লোকমন গৃহ এবং সাধুত্বকে বাস্তব আচরণের ক্ষেত্রে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ এই পার্থক্যকে স্বীকার করেন নাই। প্রথম জীবনে বরঞ্চ এই পার্থক্যের স্বীকৃতিই অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়, তখন বিষয়ে অনাসক্তি, বিষয় পরিচালনাকার্য্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ প্রভৃতি তাঁহার জীবনের লক্ষণ। কিন্তু প্রথমবার শিমলা পাহাড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, সাধনপথের প্রথম দুরারোহ চড়াইটা উত্তীর্ণ হইবার পরে, তিনি প্রথম জীবনের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ জমিদার, প্রকাণ্ড পরিবারের স্নেহ ও দায়িত্বশীল কর্তা। তখনই তাঁহার জীবনে সাধুত্ব ও গৃহীত্ব শোভনসঙ্গতি লাভ করিল। কেবল মহর্ষির পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। 'মহর্ষি' গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর যোগ্য সংজ্ঞা। দেবেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণ রাজর্ষি। রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাসের রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র-সৃষ্টির মূলে সকলের অগোচরে দেবেন্দ্রনাথের জীবন দৃষ্টান্তের প্রভাব যে নাই—তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

অথচ এই সমন্বয়কে লোকমন বুঝিতে পারে না, সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না ; তাই দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের বিশেষ মাহাত্ম্যকে লোকে সম্পূর্ণ ধরিতে পারিয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। রামকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার তাঁহাদের কাহারো পক্ষে সম্পূর্ণ প্রীতিকর হয় নাই, এমন একটা জনপ্রবাদ আছে। দুইজনেই সাধুপুরুষ, কিন্তু তাঁহাদের সাধনমার্গ এত পৃথক যে প্রীতিকর হইলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটিত। রামকৃষ্ণ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, দেবেন্দ্রনাথ গৃহী সাধু, রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী, দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদের নামটিও সহ্য করিতে পারিতেন না, রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী হইয়াও মূর্তিকে অস্বীকার করেন নাই, পরিমিত দেবতার আরাধনা দেবেন্দ্রনাথের অসহ্য ছিল—মিলনের কোন সমান ক্ষেত্রই যে নাই। কোন কোন সমালোচক পরস্পরের এই ভুল-বোঝার জন্য তাঁহাদের বাহ্য পরিবেশকে দায়ী করিয়াছেন। বাহ্য পরিবেশের বৈচিত্র্যে তাঁহারা পরস্পরকে ভুল বুঝিবেন—এমন ক্ষুদ্র তাঁহারা ছিলেন না। আসল কারণটা আভ্যন্তরিক প্রভেদ। কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বাহ্য পরিবেশের দূরত্ব অনতিক্রমনীয় ছিল না, কেশবচন্দ্র তাঁহার স্ব-সমাজভুক্ত এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তৎসত্ত্বেও শেষের দিকে কেশবচন্দ্রের সাধনরীতির পরিবর্তনের ফলে তাঁহাদের মধ্যেও ভুল-বোঝার ছায়া কি নামিয়া পড়ে নাই ?

দেবেন্দ্রনাথ গৃহী ছিলেন বলিয়াছি কিন্তু তাঁহার গৃহ অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, সমস্ত সমাজ এবং দেশ তাঁহার গৃহ ছিল। নিছক গৃহীর নিজ গৃহটিই গৃহ ; সাধু গৃহীর গৃহ বিরাট। তখনকার সমাজে দেবেন্দ্রনাথ একটি সামাজিক শক্তির উৎস ছিলেন। তিনি সাধুপুরুষ না হইলেও সমাজে শক্তির কেন্দ্র হইতেন ; সাধুপুরুষ ছিলেন বলিয়া এই শক্তিকে বিশেষ একটি ধারায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই সামাজিক শক্তিও তাঁহার একটি বিশিষ্ট গুণ, গৃহবাসী পুরুষের গুণ, গৃহত্যাগীর নয়।

রামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের যে সম্বন্ধ, অনেকটা সেই রকম সম্বন্ধ রামমোহনের সহিত দেবেন্দ্রনাথের। রামকৃষ্ণের সাধনবেগ ও সাধনাকে বিবেকানন্দ বাস্তবরূপ দিলেন। রাম-মোহনের ব্রহ্মসভাকে তত্ত্ববোধিনী সভায় যুক্ত করিয়া লইয়া, তাঁহার বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মকে আকার, সমাজ, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি প্রভৃতি দান করিয়া সাধারণের আচরণীয় ধর্ম করিয়া তিনি তুলিয়াছিলেন। এ কাজ কেবল সাধুপুরুষের দ্বারা হইবার নয়। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, দেশকাল-পাত্র বিষয়ে বিচক্ষণ সামাজিক প্রতিভাবান ব্যক্তির দ্বারাই মাত্র ইহা হইতে পারিত।

সেকালের সমাজ নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মুখে ছিল, বহুকালের স্তিমিত নদীতে রাজকীয় উদারতায় পূর্ববাহিনী বন্যা ঢুকিয়া পড়িয়াছে, কখন যে কাহার গৃহ ধ্বসিয়া পড়িবে ভাবিয়া দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। হিন্দু কলেজ দলে দলে কালাপাহাড় সমাজের বুকে ছাড়িয়া দিতেছে ; কেহ খৃষ্টান হইতেছে, কেহ নিরীশ্বরবাদী হইতেছে, কেহ কেহ বা একটা আস্ত বর্বর হইতেছে। রামমোহনের ভাষায় সমাজ তখন atheist ও beast-এ ভরিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার রক্ষণশীল প্রগতিবাদের আদর্শ সমাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

ব্রহ্মসভার সহিত তত্ত্ববোধিনী সভাকে যুক্ত করিয়া দিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্যভগবৎ আরাধনার একটি ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইহা পরবর্তীকালের 'হিন্দু-নই' স্বীকৃতির ব্রাহ্ম সমাজ নয়। দেবেন্দ্রনাথ কখনো নিজেকে বা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে (আদি ব্রাহ্মসমাজ) হিন্দুসমাজের বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়াই, উন্নততর তাঁহার মতে প্রকৃত হিন্দুধর্ম চর্চা, তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেই কারণেই বহুদিন অবধি, বহু চাপ সত্ত্বেও উপবীত ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেন নাই; যেহেতু তিনি মনে করিতেন উপবীত একটি সামাজিক চিহ্ন, ধর্মের সহিত তাহার যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, বরঞ্চ উপবীতত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিলে আগ্রহশীল সামাজিক হিন্দুদের তাঁহার সমাজে প্রবেশের পক্ষে একটা অন্তরায় হইতে পারে। তাঁহার পুত্রদের সকলকেই তিনি উপনীত করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকা—ওইটি তাঁহার রক্ষণশীলতা, আর উন্নততর ধর্মআচরণ, তাঁহার প্রগতি; 'রক্ষণশীল প্রগতি' তাঁহার বিশিষ্ট দান। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মকে সংক্ষেপে শালগ্রাম শিলা বা মূর্তিবর্জিত হিন্দুধর্ম বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যে-ভাঙনের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আসিয়া, প্রাচীন বেদান্তের শিলাখণ্ড স্তূপীকৃত করিয়া শক্তভাবে কূল বাঁধিয়াছিলেন, বন্যা একদিন অতর্কিতে সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। হিন্দু কলেজের ঘূর্ণি-হাওয়ার পিঠে চড়িয়া কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিলেন। 'রক্ষণশীল প্রগতি' কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদের রুচিকর মনে হইল না। তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সমাজের ভিত্তি অনেকটা ধ্বসিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণতর হইল —কিন্তু মন্দের ভালো হইল এই যে, এই অভিজ্ঞতার ফলে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিলেন। এখানেই তাঁহার সমাজ ভাঙিয়া পড়িবার কথা, কিন্তু ভাঙিয়া পড়িল না। তাঁহার সংগঠন শক্তি ও তাঁহার চরিত্রগত মাহাত্ম্য তাঁহার সমাজকে রক্ষা করিল। তিনি একক হইলেন কিন্তু একঘরে হইলেন না, ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ সব ঘরেই তাঁহার স্থান হইল।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বাঙলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি চিত্র পাই। নদীপথে ভ্রমণে বাহির হইয়া ঘন বর্ষার সন্ধ্যায় মাঝপথে তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। আত্মচরিতের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গের বর্ণনা আছে। বর্ণনার কৌশলে, ঘটনার গুরুত্বে ও বিন্যাসে এই অধ্যায়টি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি অধ্যায় বলিয়া মনে হয়। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"তখন সূর্য্য অস্ত গেল। মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল। পিনিস থামিল কিনা ভালো দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি, একটা ছোট নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি? আমার ভয় হইল। সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া একজন পাড়ের উপরে উঠিল, দেখি যে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে

একখানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আছে।...এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল।" বজ্রপাতই বটে। তবে একমাত্র নয়, প্রথমটা মাত্র! কারণ অতঃপর, একের পরে এক অনেকগুলি পরীক্ষার বজ্র তাঁহার মাথায় পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল! মহর্ষির পরীক্ষার সূত্রপাত হইল।

রাজা রাধাকান্ত দেব

ঐতিহাসিকগণ রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রতি সুবিচার করেন নাই, তাঁহাদের অধিকাংশের মতেই তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, অর্থাৎ তখন যে টানটা হিন্দুসমাজ পিছনের দিকে অনুভব করিতেছিল, তিনি ছিলেন সেই দলভুক্ত। কথাটা সত্য হইয়াও সত্য নয়, কারণ মানুষের সভ্যতা একটিমাত্র রেখা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয় না। সভ্যতা আদৌ অগ্রসর হইতেছে কিনা, সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সভ্যতা যে সচল, তাহাতে সংশয় নাই ; কিন্তু সচল হইলেই যে অগ্রসরশীল হইবে, এমন কথা নাই। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা সচল—কিন্তু তাই বলিয়া সেটা অগ্রসর হইতেছে, এমন বলা চলে না। পেণ্ডুলাম ধাক্কা প্রতিধাক্কার ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ায় সচল থাকে, তাহার চলমানতা ঘড়ির কাঁটা দুটিকে চঞ্চল করিয়া রাখে, কাঁটা দুটি সময়ের অগ্রসরতার নিদর্শক। কাল প্রগতিশীল, ঘড়ি স্থাণু ; স্থাণু ঘড়ি প্রগতিশীল কালের নিদর্শক। ইতিহাসের সময় প্রগতিশীল, মানুষের সভ্যতা ঘড়ির ন্যায় স্থাণু অথচ চঞ্চল, পেণ্ডুলাম এই চঞ্চলতার কারণ। মহাপুরুষগণ পেণ্ডুলামের ন্যায় ইতস্তত আঘাত-প্রত্যাঘাত খাইয়া ঘড়িকে, সভ্যতাকে সক্রিয় করিয়া রাখিয়াছেন। মহাপুরুষগণ সক্রিয়, সভ্যতা চঞ্চল—এই পর্য্যন্তই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তদতিরিক্তের প্রমাণ নাই।

এই চঞ্চলতার জন্য ধাক্কা প্রতিধাক্কা অত্যাবশ্যক। যদি তাই সত্য হয়, তবে ধাক্কাটাকে বড় মনে করিয়া প্রতিধাক্কাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া হেয় করিব কেন ? ঐতিহাসিক কালের আমীন, সে ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, সমস্তকে জরিপ করিয়া যাইবে, কোনটাকে হেয় করিবার বা কোনটাকে শ্রেয় মনে করিবার কাজ তাহার নহে। ঐতিহাসিক moralist নহে। Moralist মরালের মত জল বাদ দিয়া দুধটুকু মাত্র লইতে পারেন ; ঐতিহাসিককে গোয়ালার মতো জল-মিশ্রিত দুধ বহন করিতে হইবে, পারিলে গোরুটাকে শুদ্ধ বহন করা উচিত। কিন্তু দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক কখন নিজের অগোচরে moralist সাজিয়া বসেন, বসিয়া অব্যাপারে রত হন। এই অব্যাপারীদের হাতে অনেকের লাঞ্ছনা হয়, রাজা রাধাকান্ত দেবও লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

ঐতিহাসিকগণ বলিবেন যে, তৎকালীন সামাজিক পিছুটানে রাজা রাধাকান্ত দেবের হাত ছিল। কিন্তু কোন্‌কালে সমাজে পিছুটান নাই ? পিছুটানটা যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সমাজরক্ষার পক্ষে অবশ্যই তাহার প্রয়োজন আছে, আর সেই প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে যদি রাধাকান্ত দেব থাকিয়াই থাকেন, তবে এমন ক্ষতি কি ? এই পর্য্যন্ত বলা চলে যে, তিনি অন্য পক্ষভুক্ত ছিলেন, যে-পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন, সে-পক্ষে নয়।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা কারণে তিনি তুলিত হইয়াছেন, যদিচ তাঁহার জন্মসীমা রামমোহন রায়ের জন্মকালের প্রায় সমলগ্ন। কিন্তু রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই

একই কর্মকালের অন্তর্গত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র-চরিত্র বর্ণনা সম্বন্ধে তাঁহার কর্মনীতিকে 'রক্ষণশীল প্রগতিবাদ' বলিয়াছি, এবারে রাধাকান্ত দেবের কর্মনীতিকে 'প্রগতিশীল রক্ষণবাদ' বলিলে অন্যায় হইবে না। দুজনেই সমাজের মঙ্গলকামী ছিলেন, কেবল মঙ্গল কামনার ঝোঁকটা দুজনের দুই ভিন্ন স্থানে পড়িয়াছে—নতুবা অপর কোন প্রভেদ তো দেখি না।

সেকালের সমস্ত মহৎ কর্মের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের যোগ ছিল। তিনি হিন্দু কলেজ, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি সহমরণ-প্রথার সমর্থক হইয়াও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে ছিলেন; শোভাবাজার রাজবাটীতে বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সংস্কৃত চর্চার পোষ্টা ছিলেন, বহু ব্যয় করিয়া 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে বিরাট সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আবার বাঙলা ভাষার উন্নতি বিষয়েও তিনি অমনোযোগী ছিলেন না। বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং 'বাঙলা পাঠশালার' পৃষ্ঠপোষক হইয়া তিনি মাতৃভাষায় অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। সেকালে রক্ষণশীল, প্রগতিশীল, নরম, গরম, সকলেই মিশনারীদের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত থাকিত। সুন্দরবনেও মানুষে মানুষে নিশ্চয় শরিকানি আছে, কিন্তু বাঘের ভয়ে সকলেই ভীত। তৎকালে মিশনারীদের সমাজনাশক অত্যাচারের ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও রাধাকান্ত দেব, দুই দলের নেতৃস্থানীয় একাধিকবার পরস্পরের হাত ধরিয়া কাজে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন—"১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে, ১৮৮৫, রবিবার) আমাদের একটা মহাসভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদের একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদা-পুস্তক লইয়া, তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছি। এমন সময়ে আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা, এইরূপে সেইদিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে 'হিন্দু হিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন।"

দেবেন্দ্রনাথ ও রাধাকান্ত দেব বিরুদ্ধ পক্ষভুক্ত ছিলেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক স্থানে তাঁহারা সভাপতি ও সম্পাদকরূপে মিলিত হইয়াছিলেন। সে স্থানটি সমাজের মঙ্গলকামনার স্থান।

শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের পরে কলিকাতার যেসব বিশিষ্ট নাগরিক একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেন, সেই তালিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র,

রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাদরী লঙ্ সাহেবের নাম দেখিতেছি। ইহারা সকলেই সামাজিক প্রগতিবাদের দলে, অন্তত কাহাকেও রক্ষণশীল বলা চলে না। তারপরে রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধা রহিয়াছে। এই সব ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাধাকান্ত দেবের সমকালীন সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিই তাঁহাকে সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকামী বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাকে পিছুটানের দলভুক্ত বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতেন না, বস্তুত পিছুটানের দলভুক্ত বলিয়া যে মনে করিতেন, তাহারই প্রমাণাভাব। খুব সম্ভব একালের আমরা, আমাদের সিদ্ধান্তকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেকালের ঘাড়ে চাপাইয়া একটা অনর্থক দলাদলির সৃষ্টি করিয়াছি। একালের চশমায় সেকালকে দেখিতে গিয়া অকারণ একটা কুয়াসার সৃষ্টি করিয়াছি — এই কুয়াসা আমাদের স্বকৃত, যে-দলাদলির সুগভীর জলাভূমিতে আজ আমরা আকণ্ঠ নিমগ্ন-প্রায়, সেই জলাভূমির বিষবাষ্পই এই কুয়াসার কারণ।

আগে বলিয়াছি, সকল মহৎ ব্যক্তিই সমাজের মঙ্গলকামনা করেন, কেবল এক-এক-জনের মঙ্গলকামনার ঝোঁকটা এক-এক স্থানে। রাধাকান্ত দেবে ও দেবেন্দ্রনাথে এই রকম একটা প্রভেদ ছিল। রাধাকান্ত দেব ছিলেন 'প্রগতিশীল রক্ষণবাদী,' আর দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন 'রক্ষণশীল প্রগতিবাদী', এই দুটি সংজ্ঞায় যে প্রভেদ, তাহা কেবল ঝোঁকের তারতম্যের প্রভেদ। রাধাকান্ত দেব সহমরণ-প্রথাকেও রাখিতে চাহিতেন আবার স্ত্রীশিক্ষারও প্রসার চাহিতেন। তিনি ব্রহ্মসভার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ধর্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন, আবার তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতার সহিত একযোগে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় চালাইতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কোন সামাজিক প্রথা, তাহা যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, তাহাকে তিনি ছাড়িতে নারাজ ছিলেন, অথচ বাহির হইতে আহরণ করিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু যে বিষয়টি তিনি বুঝিতে পারেন নাই, সেটি এই যে, একই সঙ্গে সহমরণ-প্রথা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার অচল, কারণ শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষাই সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিবে। সমাজের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসাই তাঁহাকে সামাজিক কু-প্রথারক্ষণে আগ্রহশীল করিয়া রাখিয়াছিল, কৃপণ যেমন বাড়ির খড়কুটা আবর্জনাও জমাইয়া রাখে। আহরণে তাহার অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু আহরণ ও বর্জন সমতালে না চলিলে যে স্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে, শেষ পর্য্যন্ত তাহারই চাপে সমাজের প্রাণ বাহির হইবার আশঙ্কা। এই অতি সামান্য কথাটি না বুঝিবার ফলে তাঁহার বহু সংকীর্তির চিহ্ন কতক পরিমাণে স্তূপীকৃত জঞ্জালের আড়ালে গিয়া পড়িয়াছে, বাড়ীর সম্মুখের জঞ্জাল পরিষ্কার না করিলে কিছুদিন পরে বাড়ীটা যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়। রাধাকান্ত দেবের বিরুদ্ধে কিছু যদি অভিযোগ থাকে, তবে ইহাই একমাত্র অভিযোগ। পিছুটানটা অভিযোগ নয়, কারণ একমাত্র পিছুটানের ফলেই সভ্যতার অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর।

প্রিন্স টারাগোনা

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিহাসে আমরা এক নূতন ধরণের ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। বর্তমান যুগকে, এদেশে ও বিদেশে, বরঞ্চ বিদেশের প্রভাবের ফলেই এদেশে কৃতী মধ্যবিত্তের যুগ বলা উচিত। ফরাসীবিপ্লব মধ্যবিত্ত সমাজের জাগরণের যুগ। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত নিজের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া, সেই গুরুত্বকে সামাজিক পদমর্য্যাদা অর্জনের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, সমাজে ধন ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আসনদ্বয়কে এক ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্বতন যুগে ধন ও ধী পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছিল। সেকালের বহু অভিজাত ব্যক্তি ধন ও ধী-তে সম্পন্ন ছিল বটে কিন্তু সে ধন তাহাদের স্বোপার্জিত নহে, বংশক্রমাগত। আবার তাহাদের বংশলতিকার মূল পর্য্যন্ত গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে ব্যক্তি ধনের বনিয়াদ স্থাপন করিয়াছিল, তাহার আর যে গুণই থাকুক সে বুদ্ধিবৃত্ত ছিল না, হয় সৈনিক নয় বোম্বেটে বা ডাকাত, নয় ব্যবসায়ী অথবা রাজকর্মচারী ছিল, তাহাকে কোনক্রমেই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বলা চলে না। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের প্রাক্‌কালে সামাজিক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত তাহার বুদ্ধিকে কেবল জ্ঞানান্বেষণে নয়, ধনান্বেষণেও নিয়োগ করিল এবং বুদ্ধির প্রসাদ তাহার উপরে আছে বলিয়াই এক পুরুষকালের মধ্যেই নূতন শ্রেণীর কৌলীন্য লাভ করিল—সে কৌলীন্যের মাহাত্ম্য এমনি যে বহু শতাব্দীর অভিজাত ব্যক্তিও তাহাকে উপেক্ষা করিতে সাহস পাইল না। ইহাকেই বলিতেছি—কৃতী মধ্যবিত্তের—অর্থাৎ কৃতী মধ্যবিত্ত ধনীর যুগ। বিদেশে এই শ্রেণীর নিদর্শনরূপে ভলটেয়ারকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, বস্তুতঃ তাঁহাকে কৃতী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্রষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভলটেয়ার মনীষী ছিলেন, তাঁহার প্রচুর মনীষার একটা অংশকে ধন ও সামাজিক পদমর্য্যাদা অর্জনের জন্য নিয়োগ করিয়া তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। তৎকালীন ফরাসী অভিজাত শ্রেণী তাঁহাকে 'হঠাৎ-নবাব' মনে করিতে পারিত। কিন্তু করে নাই। আর শুধু অভিজাত শ্রেণীই বা কেন সেকালে ইউরোপে এমন রাজামহারাজা ছিল না, ভলটেয়ারের একখানা চিঠিকে শিরোভূষণ মনে না করিত। ফ্রেডারিক দি গ্রেট, ক্যাথারিন দি গ্রেট এই মধ্যবিত্ত লেখককে গুরু ও বান্ধব মনে করিয়া গৌরব বোধ করিতেন। এই লক্ষণটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক আব-হাওয়ায় প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন দেখা দিতেছিল—কিন্তু পরিবর্তন তো অমনি আসে না, যে সব কারণে আসিতেছিল ভল্‌টেয়ারের মনীষা, সেই মনীষার নূতন পথে নিয়োগ তাহাদের অন্যতম।

দ্বারকানাথকে গুরুত্বে ভল্‌টেয়ারের সঙ্গে তুলনা না করিয়াও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বাঙালীসমাজে তিনি অনুরূপ পরিবর্তনের সূত্রপাত করেন—তিনিই আমাদের সমাজের প্রথম

মধ্যবিত্ত মনীষী ধনী—পরবর্তী কৃতী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদিম পুরুষ। তখনকার দিনে প্রাচীন অভিজাত বংশগুলি লোপ পাইতেছিল, নূতন আভিজাত্যের তখনও গোড়াপত্তন হয় নাই—সেই শূন্য স্থানের "No man's Land"-এ দ্বারকানাথ স্বীয় প্রতিভাসহায় হইয়া প্রবেশ করিলেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের শিখরীদেশ ত্রিশ বৎসরের অধিক বিস্তৃত হইবে না, প্রভূত ধনার্জন করিয়া বাঙলা দেশের ধনিশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে-ব্যক্তি নিজের হাতে ব্যবসায় করিয়া ধনোপায়ের সূত্রপাত করে, তাহার হাতে যে কালি ও গায়ে যে গ্লানি সাধারণত দৃষ্ট হইয়া থাকে, দ্বারকানাথের ক্ষেত্রে তাহার কিছুই দৃষ্ট হইত না।, তিনি এক পুরুষের ধনী হইয়াও বহুপুরুষের কৌলীন্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা কি ভাবে সম্ভব হইল? এই সম্ভাবনার কারণ কতকটা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভা, কতকটা শ্রেণীগত সংস্কৃতি। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তিনি অন্তর্গত, তাহার বহুকালের আয়ত্ত শিক্ষাদীক্ষা এবং তাঁহার ব্যক্তিগত চারিত্রিক উদারতা ও মনীষা তাঁহাকে হঠাৎ-নবাবে পরিণত না করিয়া প্রিন্স টাগোর বা বিদেশীদের মুখে প্রিন্স টারাগোনায় পরিণত করিল। এই দৃষ্টিতে দেখিলে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আমাদের সমাজবিবর্তনের একটি ধারার সূত্রধার বলিয়া গণ্য না করিয়া উপায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত, দেবেন্দ্রনাথের ত্রিশ বৎসর বয়সে, দ্বারকানাথের মৃত্যুর বৎসরদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার ব্যবসা ধূলিসাৎ হইয়া গেল—মাত্র ত্রিশটি বৎসর। এই প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পরেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের যেটুকু বাঁচিল তাহাতেই তাঁহার উত্তরপুরুষদের ধনী করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু দ্বারকানাথের মূল ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তাহা নগণ্য।

চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেবের অধীনে তিনি ছয় বৎসরকাল সেরেস্তাদারের কাজ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ইহাতেই তাঁহার ধনার্জনের হাতে খড়ি হয়—কিন্তু তারপরেই তাঁহার ভাগ্যে ঐশ্বর্য্যের কোটালের বান ডাকিল। দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার লিখিতেছেন—"তিনি কার, ঠাকুর কোম্পানী নামে এক কোম্পানী খুলিলেন। কয়েকজন অংশীদারের সঙ্গে মিলিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিলাইদাতে নীলকুঠি, কুমার-খালিতে রেশমের কুঠি, রাণীগঞ্জের সমস্ত কয়লার খনি এবং রামনগরের সমস্ত চিনির কারখানা কিনিয়া এবং যোগ্যতার সহিত চালাইয়া দ্বারকানাথ অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তর অর্থ করিলেন। তখন হু হু করিয়া রাজসাহীতে, পাবনায়, রংপুরে, যশোহরে জমিদারী কিনিয়া তিনি বাঙলা দেশের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়া বসিলেন।"

অথচ আজ তাঁহার পরিচয় জমিদার বলিয়া নয়, ধনী বলিয়া নয়, ব্যবসায়ী বলিয়া নয়; যদি ইহার অধিক পরিচয় তাঁহার না থাকিত, তবে বহুতর ধনীর মতোই আজ তাঁহার কোনই পরিচয় থাকিত না। দ্বারকানাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি রামমোহন রায়ের বন্ধু, মোক্ষমূলারের বন্ধু। এদেশের ইংরাজি-শিক্ষার সূত্রপাতে বিবিধ সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানের বদান্য পৃষ্ঠপোষক। ছাপাখানার স্বাধীনতা-আন্দোলন ও সতীদাহ-নিবারণ-আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান সহায়।

আবার "ইংরাজ সরকারের সকল কাজেই তিনি সহায় ছিলেন, পরামর্শদাতা ছিলেন।" অথচ সরকার হইতে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়াও চলিতেন, নতুবা তাঁহার মতো ব্যক্তির রাজদত্ত উপাধি না পাইবার কথা নয়।

তিনি ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে গিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত ও মনীষিগণের বন্ধুত্ব অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে একাধিকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের রাজা ও রাণী—লুই ফিলিপ ও তাঁহার পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন; তাঁহার ব্যাধির সময়ে Duchess of Cleaveland ও Duchess of Inverness দেখিতে আসিতেন বা সংবাদ লইতেন; আর একদিকে দেখিতে পাই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বার্জফ ও মোক্ষ-মূলারের সঙ্গেও তাঁহার সমান হৃদ্যতা। অর্থ যতই শক্তিশালী হোক—এমনটি কেবল অর্থের দ্বারা সম্ভবে না। অর্থের সঙ্গে শ্রেণীগত সংস্কৃতি বা ব্যক্তিগত মনীষা ও উদারতার সম্মিলন ঘটিলেই মাত্র এমন হইতে পারে।

দ্বারকানাথ ভোগী ছিলেন, বিলাতী সমাজের ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল—এ সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির বনিয়াদি শিথিল হয় নাই—সেখানে গভীর স্বদেশানুরাগ অটল ছিল। প্যারিসে থাকাকালীন মোক্ষমূলারের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে তিনি একটি ভারতবর্ষীয় গান শুনাইলেন। মোক্ষমূলারের তাহাতে কোন রস পান নাই শুনিয়া তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন,—"তোমরা দেখিতেছি সবাই সমান—যেমন সঙ্গীতে তেমনি অন্যান্য সকল বিষয়ে। তোমরা বুঝিবার চেষ্টামাত্র করো না। তোমরা বলো, আমাদের দেশের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়; দর্শনশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রই নয়। আমরা ইউরোপের সকল জিনিষই বুঝিবার এবং আদর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করিও না যে, ভারতবর্ষের জিনিসকে আমরা অশ্রদ্ধা বা অনাদর করি। আমাদের কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র যদি পড়ো, তবে দেখিতে পাইবে যে আমরা 'হিদেন' নই। সেই অচিন্ত্য, অনির্বচনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তোমাদেরই মতো,—চাই কি, কোন কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, তোমাদের চেয়েও গভীরতর ও নিবিড়তর।" রামমোহন রায়ের বন্ধু ছাড়া এমন কথা আর কে বলিতে পারিত। হঠাৎ এই উক্তিটাকে রামমোহনের বলিয়া ভ্রম হওয়াও আশ্চর্য্যের নয়।

প্যারিসে থাকিবার সময়ে এক সান্ধ্যসম্মিলনে সমস্ত ঘরটিকে তিনি উৎকৃষ্ট ভারতীয় শাল দিয়া সাজাইয়াছিলেন—আর সেই সম্মিলনীতে যতগুলি ফরাসী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, বিদায়কালে সকলকেই তিনি একখানা করিয়া শাল উপহার দিয়াছিলেন। ইহার পরেও যে তাহারা দ্বারকানাথকে 'প্রিন্স টারগোনা' মনে করিবে আশ্চর্য্য কি! 'কাউণ্ট অব্ মন্টিক্রিস্টো' বলিয়া যে মনে করে নাই ইহাতেই তো যথেষ্ট সংযমের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্য যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত মনীষা বংশগত হইয়া উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে আর একবার দেখা দিল।

তাঁহার এক উত্তরপুরুষ, তাঁহার মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যেই ইউরোপে গিয়া নূতন ঐশ্বর্যের অবতারণা করিলেন। কিন্তু এবারে আর ভারতবর্ষীয় শাল নয়! রামমোহন-দ্বারকানাথের সময় হইতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের যে সমন্বয়প্রচেষ্টা চলিতেছিল—এবারে প্রায় তাহার সন্ধিকাল সমাগত। দ্বারকানাথের গান শুনিয়া ইউরোপের পণ্ডিত হাসিয়াছিল, তাঁহার পৌত্রের গান পড়িয়া সমস্ত ইউরোপ মুগ্ধ হইয়া গেল। পৌত্রের মহৎ প্রতিশোধগ্রহণে পিতামহ হয়তো পরলোকে বসিয়া সান্ত্বনা পাইয়া থাকিবেন! কে বলিতে পারে।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম মুছিবার নয়। সাহিত্যিক হিসাবে নয়, সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকরূপেই তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যতীন্দ্রমোহনের সময়োচিত উৎসাহ ও আহ্বান না পাইলে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর রচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন কিনা সন্দেহ।

"তখন বেলগাছিয়ার নাটাশালায় রত্নাবলী নাটকের রিহার্সাল চলিতেছে, সেই সময় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মধুসূদনের মধ্যে হঠাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের দোষ-গুণ লইয়া তর্ক বাধিয়া উঠিল। মধুসূদন বলিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ যতদিন না বাঙলায় প্রবর্তিত হবে, ততদিন বাঙলা নাটকের উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, বাঙলাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তনের বাধা এ-ভাষার স্বভাবের মধ্যেই আছে, কাজেই কখনো হবে বলে মনে হয় না।

বাধা শুনিয়া মধুসূদনের সমস্ত ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিল—তিনি বলিলেন, এ পর্য্যন্ত চেষ্টা হয়নি বলেই সম্ভব হয়নি।

—দেখুন না কেন, ফরাসীসাহিত্য বাঙলার চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ, যতদূর জানি, তাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাই।

—সে কথা ঠিক, সাহেব মাইকেল বলিলেন, কিন্তু মনে রাখবেন, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বঙ্গভাষা, তার পক্ষে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয়।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন—আপনি মনে রাখবেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরগুপ্ত অমিত্রাক্ষরকে ঠাট্টা করে লিখেছেন—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।

মধুসূদন হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—বুড়ো ঈশ্বরগুপ্ত অমিত্রাক্ষর লিখতে পারেনি বলেই আর কেউ পারবে না, তার কি মানে আছে?

ঈশ্বর গুপ্ত তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

মাইকেল ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিলেন—আচ্ছা কেউ না লেখে, আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখবো।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, বেশ! আপনি যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখতে পারেন, আমি তা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে দেবো।

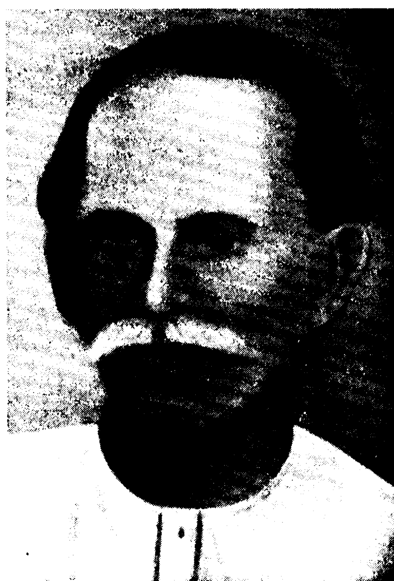
ইহা শুনিয়া মধুসূদন আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তাহলে ক'দিনের মধ্যেই আমার কাছ থেকে অমিত্রাক্ষরের নমুনাস্বরূপ খানিকটা কাব্যের অংশ পাবেন।



যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর



রামগোপাল ঘোষ



অক্ষয় দত্ত



রাজনারায়ণ বসু

ক'দিনের মধ্যেই তিনি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের কিয়দংশ লিখিয়া যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া নিজের খরচে তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথম সংস্করণ ছাপাইয়া দিয়াছিলেন।"

মাইকেল তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের নিকটেই বোধ করি সবিশেষ ঋণী ছিলেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি তিনি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দিয়াছিলেন, উপহার দিবার সময়কার একটি আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছিল।

মাইকেলের কাব্য-জীবন অপরের স্পর্দ্ধিত আহ্বানের বেগে বারংবার অভাবিতভাবে মোড় ফিরিয়া গিয়াছে; সময়োচিত উত্তেজনা না পাইলে মাইকেল আদৌ বাঙলাসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই সব আহ্বানের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আহ্বানকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কারণ এই সূত্রেই অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি। যতীন্দ্রমোহনের গৌরব এই যে, মানসিক উত্তেজনার দ্বারা মধুসূদনের মনে যে কাব্যাগ্রহ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যথাসময়ে তাহাকে বাস্তব আশ্রয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। মাইকেল বারংবার যতীন্দ্রমোহনের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। তখন কবি হয়তো পৃষ্ঠপোষকের বদান্যতা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন —

'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'

আর আজ বাঙলাসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিপরীত অর্থে ওই এক কথাই বলিতেছে—

'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'

ধনী যতীন্দ্রমোহন আজ কবি মধুসূদনের অনুগ্রহেই 'পশিয়াছে যশের মন্দিরে।' সেদিনের পৃষ্ঠপোষিত কবিই আজ সত্যকার পৃষ্ঠপোষক। আজ মাইকেলের প্রসঙ্গ ব্যতীত যতীন্দ্রমোহনের স্মরণীয়তার আর কি দাবী আছে। সম্রাট বিক্রমাদিত্য যে আজ সভাষদ কালিদাসের অনুগ্রহেই জীবিত। ইতিহাসের ঘোড়া উল্টারথ টানিতে বড়ই আনন্দ পাইযা থাকে।

প্রাচীনকালে সব দেশেই ধনী ব্যক্তি সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রাচীন বাঙালী কবিগণ সকলেই কোন-না-কোন ধনী ব্যক্তির আশ্রিত ছিলেন। উদরান্নের জন্য সাধারণ লোকের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা লোক-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল লোক-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে শিকড় বসাইবার পরে সমাজের অবস্থার দ্রুত বদল হইতে লাগিল। পুরাতন ধনাঢ্যগণ লোপ পাইতে লাগিল—কে আর তেমনভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে? এই সময়কার অধিকাংশ পাঁচালীকার ও 'কবি'গণ ধনাঢ্যের পৃষ্ঠপোষকতার আশা ত্যাগ করিয়া সরাসরি লোকাশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, আর সেই কারণেই তাহারা যে বস্তু সৃষ্টি করিল, তাহা লোক-সাহিত্য হইল না। লোক-সাহিত্য কি নয়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দাশরথির পাঁচালী।

এই সময়ে ইংরেজি-শিক্ষার প্রভাবে বাঙলাসাহিত্যের ভাগীরথীতে বাহির সমুদ্রের জোয়ার দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং দেশের সৌভাগ্যবশত কয়েকজন শিক্ষিত মার্জিতরুচি ধনীব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাসকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপ চন্দ্র এবং যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবানগণ বাঙলাসাহিত্যের ভাগীরথীর তীরে স্ফটিকের ঘাট বাঁধিয়া না দিলে পরবর্তীকালের পাঠকগণের পক্ষে কাদা ভাঙিয়া স্রোতস্বিনী পর্য্যন্ত পেঁৗছানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিত! মাইকেলের কথাই ধরা যাক। বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবা-মাত্র কুহু ও কেকা তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল, অবশ্য দাঁড়কাকের আওয়াজেরও অভাব ছিল না। তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে, তাঁহার কাব্যের অর্থাগম মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না। সমস্ত পুস্তক নিজেকে খরচ করিয়া ছাপিতে হইলে আদৌ ছাপিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এরকম ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য্য। তাঁহার আর যাহারই অভাব হোক, পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয় নাই। বদান্য পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে মাইকেলের গ্রন্থাবলী হয়তো পাণ্ডুলিপি আকারে পরবর্তীকালের হাতে আসিত। দাশরথি রায় যে-সমাজের উপরে নির্ভর করিতেন, মাইকেলের পাঠক-সমাজ তাহা হইতে স্বতন্ত্র, বস্তুত তাঁহার জীবনকালে তাঁহার কাব্যের পাঠক ছিল, কিন্তু পাঠকসমাজ বলিয়া কিছু ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই বোধকরি, প্রথম বাঙালী লেখক, যিনি নিছক সাহিত্যের প্রেরণায় লিখিয়াছেন—অথচ পাঠকসমাজের অভাব অনুভব করেন নাই এবং তিনিই বোধকরি প্রথম বাঙালী লেখক, যাঁহার পৃষ্ঠপোষকের আবশ্যক হয় নাই; যে-সমাজের সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র. সেই সমাজই পাঠকসমাজরূপে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের কাজ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের আগের বাঙলাসাহিত্য পৃষ্ঠপোষকের সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখাইলেন যে, ধনীর আশ্রয় স্বীকার না করিয়াও এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, যাহার অর্থাগমের পথ অপ্রশস্ত নহে। কিন্তু একথাও বোধকরি সর্বাংশে সত্য নয়, কারণ পূর্বতন পৃষ্ঠপোষকের স্থান এখন সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, নবীন সেন প্রভৃতি সেকালের অধিকাংশ সাহিত্যিকই সরকারী চাকুরে। তাঁহারা আসরের শ্রোতার পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইলেন—কিন্তু আর এক প্রকার পরাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফল ভালো হইল কি মন্দ হইল কে বলিবে? হয়তো ভালোয় মন্দয় মিশিয়া ফলোদয় হইয়াছে। ইহা কম সৌভাগ্য নয়।

প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের রসগ্রাহীরা ছিলেন শ্রোতা, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে তাঁহারা হইয়া দাঁড়াইলেন পাঠক, মাইকেলের সময়টা মাঝামাঝি—এই অরাজকতার পর্বটায় কয়েকজন বদান্য পৃষ্ঠপোষক অগ্রসর হইয়া আসাতে বাঙলাসাহিত্য অনেক দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল।

রামগোপাল ঘোষ

ডিরোজিওর ছাত্রদের অনেকের প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও এক জায়গায় তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল—তাঁহারা সকলেই বিদ্যাকে একটি মহতী শক্তিরূপে দেখিতেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, 'নলেজ ইজ পাওয়ার' এবং সেইরূপেই অর্জিত বিদ্যাকে তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। জ্ঞানের আনন্দময় মূর্তির স্বরূপ তাঁহারা জানিতেন না। ছোট ছেলে হাতে কোন অস্ত্র পাইবামাত্র আশেপাশের বস্তুকে আঘাত করিতে থাকে। ডিরোজিওর ছাত্রদের হাতে বিদ্যা ছিল অস্ত্র, আর প্রথম ইংরাজিশিক্ষার আমলে তাঁহারা সকলেই শিশুর মতো ছিলেন। এই পর্য্যায় হইতে কেবল রামতনু লাহিড়ীকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার সতীর্থদের সক্রিয় ব্যক্তিত্বের সহিত রামতনুর নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব তেমন খাপ খাইত না। বিদ্যার গৌরবে দেশের উন্নতি করিবার দিকে তাঁহার তেমন ঝোঁক ছিল না। তিনি নিজে ভরপুর হইয়া বিরাজ করিতেন, আর সকলের মতো তাঁহার ব্যক্তিত্ব উপছিয়া পড়িয়া বিচিত্র কর্মের অভিমুখে ধাবিত হয় নাই। এমন যে হইতে পারিয়াছিল তাহার কারণ তিনি জ্ঞানের আনন্দময় মূর্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব, ডিরোজিওর ছাত্রগণের সাধারণ লক্ষণ নয়।

জ্ঞান যে কেবল শক্তি নয়, আনন্দও বটে, এই কথাটা ডিরোজিওর ছাত্রগণ বুঝিতে না পারিলেও তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীদের অনেকে বুঝিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের প্রধান। রাজনারায়ণ বসু যদিচ ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন তথাপি তিনি পরিণত জীবনে জ্ঞানকে আনন্দরূপেই দেখিতেন, এটি মহর্ষির প্রভাবে সম্ভব হইয়াছিল কিন্তু—আর এক দিকে আবার মহর্ষির ভাবগোষ্ঠীর অন্তর্গত অক্ষয় দত্তের কাছে জ্ঞান ছিল মহতী শক্তি।

কিন্তু মোটের উপর সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, ডিরোজিওর ছাত্রগণ সকলেই জ্ঞানকে অস্ত্ররূপে ধারণ করিয়া সমাজসংস্কারে বাহির হইয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা যত ভাঙিয়াছেন তত গড়িতে পারেন নাই, যত আঘাত করিয়াছেন তত আনন্দ দিতে পারেন নাই, কিন্তু তখন বোধ করি ভাঙিবার, আঘাত করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

রামগোপাল ঘোষ ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। বিদ্যারূপ অস্ত্রবলে তিনি বলীয়ান ছিলেন এবং যতদূর মনে হয়, সেজন্য তাঁহার অভিমানও অল্প ছিল না। বিদ্যা যে বিনয় দেয়—একথা সেকালের বাঙালী বোঝে নাই। একালের বাঙালীও বুঝিতে পারিয়াছে কি? বাঙালীর নৈয়ায়িক বুদ্ধি বস্তুকে পাইবামাত্র বিশ্লেষণ করিতে বসে, বিশ্লেষণে আনন্দ নাই। ডিরোজিওর ছাত্রগণ প্রাচীন নৈয়ায়িকদের ইংরাজি সংস্করণ।

রামগোপাল ঘোষ ১৮১৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার সামান্য অবস্থা ছিল, অপর এক ব্যক্তির সহৃদয়তায় তিনি পুত্রকে হিন্দু

কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। অল্পকালের মধ্যেই রামগোপালের মেধা ডিরোজিওর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আবার রামগোপালও তাঁহার ভাবী সুহৃদবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে কলেজের পড়া সাঙ্গ করা লিখিত ছিল না। ১৮৩২ সালে তিনি একজন বিদেশীর সহকারীরূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৪৮ সালে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নামিলেন—এক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত ধনোপার্জন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু রামগোপাল ঘোষের ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধি নয়। ব্যবসায়ের খাতে তাঁহার শক্তির সামান্য অংশই প্রবাহিত হইয়াছিল। নিজের জন্য জ্ঞানার্জন ও দেশের জন্য কল্যাণ-কর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বাড়িতে তাঁহার বন্ধুগণ, ডিরোজিওর শিষ্যগণ মিলিত হইতেন। "তাঁহার বাটি ঐ সময়ে ইংরাজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এইজন্য তিনি 'এজু রাজ' অর্থাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইংরাজিওয়ালাদিগের অনভিষিক্ত রাজা (uncrowned king) ছিলেন।" "এজুরাজের" সভায় বন্ধুগণ নিয়মিত আসিতেন, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি। এই রসিককৃষ্ণ আদালতে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সাক্ষ্য দিতে অনুরুদ্ধ হইলে উত্তর দিয়াছিলেন—

"I do not believe in the sacredness of the Ganges."

একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত আর কোন পদার্থের 'সেক্রেডনেস'এ ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন না—এবং এ বিশ্বাস তাঁহাদের সত্য ছিল। আরও একটি পদার্থের Sacrednessএ ইঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন, মদ্যপানের উপকারিতা। ইঁহাদের মদ্যপান একটি Positive গুণ ছিল। লোকে নেশার জন্য মদ খায়, ইঁহারা কর্তব্যবোধে মদ খাইতেন, লোকে হতাশ হইয়া মদ খায়, ইঁহারা দেশের উন্নতি হইবে আশায় মদ খাইতেন; ইঁহারা সুরধুনীর পবিত্রতার বদলে সুরাধুনীর পবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মতো কিছুতে বিশ্বাস না করিবার চেয়ে মদ্যপানের উপকারিতাতে বিশ্বাস করাও বোধকরি অধিকতর স্বাস্থ্যকর। আরও একটি বন্ধন ইঁহাদিগকে একত্র করিয়া রাখিয়াছিল। রামগোপালের বন্ধুপ্রীতি। তাঁহার বন্ধুগণ অনেকেই তাঁহার নিকট বাস্তব ঋণে ঋণী ছিলেন। মৃত্যুকালে রামগোপাল সেইসব দলিল পোড়াইয়া ফেলিয়া বন্ধুদিগকে চল্লিশ হাজার টাকার ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

দেশের কল্যাণসাধনের প্রধান অস্ত্র ছিল রামগোপালের অসাধারণ বাগ্মিতা। একালের আমরা বাগ্মিতাকে মনে মনে উপহাস করিয়া থাকি, বলি যে বক্তৃতায় কিছু হইবার নয়, কিম্বা বলি যে বক্তৃতার দিন চলিয়া গিয়াছে। দুটাই সত্য একালের পক্ষে,—কিন্তু সেকালের পক্ষে বক্তৃতার প্রয়োজন ছিল। যাত্রার লড়াইয়ে প্রথমে বাগযুদ্ধ হয়, তারপরে বাহুবলের পালা। আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই প্রথম আমল বাগযুদ্ধের সময় ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে যে বক্তৃতার যুগ গিয়াছে একথা সত্য নয়, বক্তৃতার যুগ গিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা গিয়াছেন। এখন কর্মের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ।

সেকালে রামগোপাল ঘোষকে সরকারী ও বে-সরকারী সাহেবদিগের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে হইত। তাহাতে যে পরিমাণে সাহস থাকিবার কথা—এখনকার লোকে তাহা অনুমান করিতেও পারিবে না। স্বদেশী আমলে একটা সাহেব মারিতে বা লবণ সত্যাগ্রহের সময়ে একটা লবণগোলা লুটিতে যে সাহসের দরকার হইত সে-আমলে একটা বক্তৃতায় তাহার কম দরকার হইত না। ১৮৪৯-৫০-এর Black Acts বা কালা কানুনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য রামগোপালকে সাহেবেরা Agri-horticultural Society-র সহকারী সভাপতির পদ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি যখন বর্তমান নিমতলার শ্মশানঘাটকে গঙ্গাতীর হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন, তখন প্রধানতঃ তাঁহার বক্তৃতাতেই সে প্রস্তাব স্থগিত হইয়াছিল।

রামগোপালের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল সাহস। সাহস একপ্রকার আত্মিক গুণ। কায়িক সাহসকেও আত্মিক গুণ বলা উচিত। আত্মার পাত্র উপছাইয়া পড়িয়াই ওই গুণ কায়িক গুণরূপে দেখা দেয়। বস্তুতঃ দুই-ই এক। রামগোপালের জীবনে কায়িক ও আত্মিক সাহস দুইয়েরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার রামগোপাল ঘোষের সহিত রাজনারায়ণ বসু স্টীমার ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এক জায়গায় নদীর চরে নামিয়া তাঁহারা পাখী শিকারে বাহির হইলেন। রাজনারায়ণের আত্মচরিতে লিখিত আছে—"একদিন রামগোপালবাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে দিলেন। আমি বলিলাম—আমি পিস্তল কখনো ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে পাছে হাতটা উড়িয়া যায়।

রামগোপালবাবু বলিলেন—গেলই বা। তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।"

রামগোপাল ঘোষের সাহেবদিগের অপ্রীতিকর বক্তৃতা এবং রাজনারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা-সূচক 'গেলই বা'—দুটাই সাহসের নিদর্শন। লোকে একটাকে আত্মিক, অপরটাকে দৈহিক বলিবে। কিন্তু দেহে ও মনে কি এতই প্রভেদ? দৈহিক সাহসেরও মূল আত্মায়, নতুবা তাহা সাহস নয় নিছক গুণ্ডামি মাত্র, গুণ্ডা সাহসী নয়, নিতান্ত কাপুরুষ।

পূর্বোক্ত ভ্রমণে বাহির হইয়া রামগোপাল ঘোষের লোটাস নামে সুদৃশ্য স্টীমার মহানন্দা নদীপথে চলিতেছে, লক্ষ্য গৌড়-নগরী পরিদর্শন। সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বন্ধু আছেন। স্টীমার চলিতে চলিতে একটা কড়কড়ে পানী বা Rapidএ পড়িল, আর অগ্রসর হইতে চায় না। আর সকলে বলিল—এবারে ফিরিয়া যাওয়া যাক।

তিনি বলিলেন—"ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, স্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। তাহাতে বয়লার ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই তাহাতে ক্ষতি নাই। রামগোপাল ঘোষ বলিতেন যে, এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই।" তখন 'কড়কড়ে পানী' পার হইবার আশায় স্টীমার হইতে কতক কতক মালপত্র নামাইয়া জাহাজখানাকে

হাল্কা করিয়া লইয়া পূর্ণবেগে চালাইয়া দেওয়া হইল। "স্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গিরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় 'কড়কড়ে পানী' কোনপ্রকারে পার হইল। নদীর দুই তীর লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল অমনি রামগোপাল বাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন—'ভয় করিলে যাঁরে থাকে না অন্যের ভয়'। কেবল অন্যের শব্দ পরিবর্তন করিয়া গান গাইতে লাগিলেন—"ভয় করিলে যাঁরে থাকে না জলেরই ভয়।"

এই ঘটনায় রামগোপাল ঘোষকে যেমন সম্পূর্ণভাবে নিখুঁৎভাবে পাওয়া যায় এমন তাঁহার বাগ্মিতাতে নয়। কিম্বা পূর্বোক্ত ঘটনা আর কিছুই না; তাহার কার্য্যের বাগ্মিতা। দুটিরই উৎসমূলে আছে একই সাহস। ডিরোজিওর ছাত্রগণ এই সাহস গুণটিকে গুরুর চরিত্র হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের গোলদীঘিতে বসিয়া সুরাপান ও শিককাবাব ভোজন, হিন্দুপাড়ায় বসিয়া নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া পাশের বাড়িতে হাড় নিক্ষেপ করিয়া 'ঐ গো-হাড় ঐ গো-হাড়' বলিয়া চীৎকার, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রকাশ্য আদালতে—

"I do not believe in the sacredness of the Ganges."

ঘোষণা এবং রামগোপালের 'কড়কড়ে পানী' পার হইতে গিয়া বয়লার ফাটিয়া উর্দ্ধগামী হইবার ইচ্ছা—সবই একই গুণের রকমফের, প্রকাশভেদ মাত্র। ডিরোজিও তখন যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছিলেন তাঁহার ছাত্রদের মাধ্যমে তাহা সঞ্চারিত হইতে হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল; আমাদের স্থাবর সমাজকে কতক পরিমাণে তাহাতে চলিষ্ণু করিয়াছে। এই কারণেই পরবর্তীকাল ডিরোজিওর ছাত্রদের অনেক দোষ, অনেক চপলতা ও ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। রামগোপাল ঘোষকে ডিরোজিওর ছাত্রদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

ইতিহাসের উপেক্ষিত নরনারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের উপেক্ষিত ব্যক্তিগণ জগতের প্রান্তবর্তী যে পান্থশালায় অপেক্ষা করিতেছে, সেখানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। বেশ বুঝিতে পারিতেছি আমার পাঠকদের মধ্যে অনেকেই নামটি এই প্রথমবার শুনিলেন ; কিন্তু প্রাক-শতবর্ষ কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ হরিহরানন্দ তীর্থ-স্বামীর অনুজ, রামমোহনের স্নেহবিশ্বাসভাজন, দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাভাজন, ব্রহ্ম-সভার প্রথম অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে না জানিয়া উপায় ছিল না।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ যদি ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের ইতিহাস হয়, এই সময়টা যদি রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের কীর্তির পর্ব হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যদি বাঙলাদেশের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন—এ সমস্ত যদি সত্য হয়, তবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় নাই।

রামমোহন আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ বালক মাত্র। তারপরে সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আত্মিকবেদনায় একদিন তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল রামমোহনের ব্রহ্ম-সভা ও তাঁহার তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে সভা দুটাই বা ভিন্ন হইয়া থাকে কেন, তিনি দুই সভাকে যুক্ত করিয়া দিলেন—এইভাবে, এই সময়ে রামমোহনের সাধনার সহিত দেবেন্দ্রনাথের সাধনা যুক্ত হইল, যে-বালকের করমর্দন করিয়া রামমোহন বিদায় লইয়াছিলেন এতদিন পরে সেই বালক যুবক হইয়া উঠিয়া তাঁহার করধারণ করিলেন। কিন্তু এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়টা নিতান্ত অল্প নয়, সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর। চৌদ্দ বৎসরে রামের বনবাসের পালা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, একটা রামায়ণের সাতটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে। এই চৌদ্দ বৎসর কাল যে-ব্যক্তি একক, অনন্যসহায় হইয়া বহু বাধাবিঘ্ন ও উপেক্ষা, অবজ্ঞার মধ্যে রামমোহনের দীপটি রক্ষা করিয়াছিলেন—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই ব্যক্তি। চৌদ্দ বৎসর কাল কাহারো কাছে সাহায্য প্রত্যাশা না করিয়া উপাসকহীন উপাসনার ও শ্রোতাহীন উপদেষ্টার কাজ হয় এক নির্বোধে নয় পরম নিষ্ঠাবানেই করিতে পারে। বিদ্যাবাগীশের নিষ্ঠা অনন্যসাধারণ ছিল, সেকালের লোকের নিষ্ঠা একালের চেয়ে বেশি ছিল, সেই নিষ্ঠাবানের যুগেও তিনি বিশিষ্ট ছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-সভার যে-অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহার একটি বর্ণনা দেওয়া হইল—"ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর, তিনি (রামমোহন রায়) এক বৎসর মাত্র

কলিকাতায় ছিলেন। তিনি যে-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি করিতেন।......ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে-সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া কোন আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টিবাদল হইলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসক এবং আচার্য্য দুইয়ের কার্য্য একাকী করিতে হইত। যে-সকল ধনী লোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। কতকগুলি মধ্যবর্তী লোক সমাজে আসিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে পথের লোক আসিয়া বসিত। কেহ কেহ বাজার করিয়া যাইবার সময়ে বাজারের ধামা হস্তে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ টিয়াপাখী হস্তে লইয়া সমাজে আসিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি তক্তপোষের উপরে বসিতেন। শতরঞ্চের উপরে চাদর বিছানো থাকিত, তাহাতেই অন্য লোক বসিতেন।”

উপরের বর্ণনা হইতে বিদ্যাবাগীশের কাজের দুরূহতার একটা আভাস পাওয়া যাইবে, তৎসত্ত্বেও তাঁহার চৌদ্দ বৎসরের নিষ্ঠা ব্রহ্মসভাকে পরীক্ষার সময়টা উত্তীর্ণ করিয়া দিল। বিদ্যাবাগীশের নিষ্ঠা ভরতের নিষ্ঠার চেয়ে অধিক বই অল্প ছিল না। নন্দীগ্রামের রাজসভায় ধামাধারীর নিশ্চয়ই অভাব ছিল না, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, সিংহাসনের উপরে ছত্রধারণের সময়ে ধামাধারীর দলকে কিম্বা টিয়াপাখী ও বুলবুলীর পৃষ্ঠপোষণের দৃশ্য ভরতকে দেখিতে হইত না।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ও সাধনার সংযোগসূত্র এই নিঃস্ব পণ্ডিত। চৌদ্দ বছরের মধ্যে এই ক্ষীণ সূত্রটি অপসারিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল—অপসারিত হইলে ব্রাহ্ম-সমাজের পরিণাম কি হইত কে জানে? তত্ত্ববোধিনী-সভা কি ব্রহ্ম-সভার সহিত যুক্ত হইত? তত্ত্ববোধিনী-সভা কি সমাজগঠনের দিকে মন দিত? না দেশের সংস্কৃতির উন্নতিবিধানের প্রতিই সমস্ত মনোযোগ নিক্ষেপ করিত? কিন্তু এ সমস্ত বৃথা জল্পনা! যাহা ঘটিয়াছে তাহার মূলে আছে এই ক্ষীণ সুত্রটি। মিছরির সূতাটিকে কে আর মনে রাখে? রসিকের মনে রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাই বলিয়া কারিগরের ভুলিলে চলিবে কেন?

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির পতাকীস্থানেও বিদ্যাবাগীশকে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের যে শ্লোকটি উড়িয়া আসিয়া মহর্ষির হৃদয় জুড়িয়া বসিল, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই তাহার প্রকৃত মর্মব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষিকে শুনাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, লালা হাজারিলাল প্রভৃতি যে ২১জন প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেন—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই তাঁহাদের দীক্ষাদাতা আচার্য্য। আচার্য্যের আচার্য্য হিসাবে বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের পরমাচার্য্য।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের পাঠ লইতেন। দ্বারকানাথ লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, পুত্রের বিষয়কার্য্যে তেমন মন নাই, তার উপরে আবার সে ধর্মগ্রন্থ পড়িতে শুরু করিয়াছে। দ্বারকানাথ জানিতে পাইলেন যে বিদ্যাবাগীশ পুত্রের গুরু। তখন তিনি বলিলেন—"আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন দেখি যে তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। এক তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।" এই কথা শুনিয়া "বিদ্যাবাগীশ ভয় পাইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, 'কর্তার মত নাই, অতএব আমি আর তোমাকে পড়াইতে পারিব না।' এই জন্যই আমি বাড়িতে তাঁহাকে আসিতে বারণ করিয়া হেদুয়াতে যন্ত্রালয়ে যাইয়া আমাকে পড়াইতে বলিয়াছিলাম। তিনিও তাই করিতেন।" কর্তৃজনের ভয়ে ভীত গুরুশিষ্যের এই গোপনসংবাদ একটি উপভোগ্য দৃশ্য। কে বলিতে পারে গুপ্তভাবে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষাদানের বিদ্যাবাগীশের মনে কি পড়িত। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' শ্লোকটি বিদ্যাবাগীশ নিশ্চয়ই জানিতেন!

এই লোকটির চরিত্রে নানারূপ বিষয়ের সমন্বয় হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই তিনি বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, অথচ রামমোহনের বিশ্বাসভাজন হইয়াও "সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইনজারী করিলে ওই আইন রহিত করিবার জন্য যে আবেদন পত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।" সহসা অজ্ঞাত কারণে সরকারী চাকুরি হারাইয়া যিনি অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তিনিই ব্রাহ্মসমাজের জন্য পাঁচশত টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আর সর্বোপরি তিনি নিজে হিন্দু থাকিয়াও হিন্দুগণকে নূতন ধর্মে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু যীশুও তো খৃষ্টান ছিলেন না, গৌতমও তো বৌদ্ধ ছিলেন না।

বৃদ্ধবয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাবাগীশ নৌকাযোগে কাশী যাত্রা করিলেন। কাশী পৌঁছিবার অনেক পূর্বেই মুর্শিদাবাদে ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। সে ১৮৪৫ সালের কথা। তারপরে একশত বছরের বেশি অতিবাহিত, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইতিমধ্যে ইতিহাসের উপেক্ষিতের দলবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। ইতিহাসের নৌকা সোনার-তরী হইতেও ক্ষুদ্রকায়, তাহাতে সব সময় সোনার ধানেরও স্থান হইয়া ওঠে না।

অক্ষয় দত্ত

এ একালের ছেলেরা অক্ষয় দত্তের নাম ভুলিতে বসিয়াছে, তাহারা পান্থপাদপ ও পুরুভুজের রহস্য জানিতে পারিল না, চারুপাঠ অনেককাল হইল পাঠ্যতালিকা হইতে বর্জিত। চারুপাঠের ভাষা দুরূহ ছিল, কিন্তু নীরস ছিল না, ফল্গু নদীর শুষ্ক বালুরাশির মত একটু খুঁড়িলেই রস পাওয়া যাইত, তবে সে রসের উৎসমূল মস্তিষ্কে। বুদ্ধিজাত এই রস বুদ্ধিবৃত্ত পাঠককে আনন্দ দিত। পাথর-চোয়ানো জলের মতো বর্ণনীয় বস্তুর নীরসতা হইতে এক প্রকার রস আকর্ষণের শক্তি অক্ষয় দত্তের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যেন তাঁর মুখমণ্ডলে আছে। টাকের আভাস-পড়া তাঁহার মাথার পুরোভাগে ঝুনো নারিকেলের শুষ্কতা, আর শাদা গোঁফ জোড়ার চারি পাশে একটি শুভ্র হাসি, কিম্বা শুভ্র হাসির আভাতেই গোঁফ জোড়া শাদা, নতুবা গোঁফ পাকিবার এখনো সময় নয়। তাঁহার মুখমণ্ডলের নিম্নার্দ্ধে ও উপরার্দ্ধে যেন তাপবৈষম্য বিরাজমান; উপরার্দ্ধের তাপের মাত্রা যেন তীব্রতর, সমস্ত ললাটখানা সেই তাপের আতিশয্যে মরীচিকার মতো থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখ ধাঁধিয়া যায়। এই তাপ জ্ঞানের দ্যুতি। উক্ত জ্ঞানের দ্যুতির উপরে হাসির একখানি সূক্ষ্ম সরস কুয়াসা মাঝে মাঝে আসিয়া পড়িত সে কুয়াসা এমনি সূক্ষ্ম যে, দীপ্তিকে বাধা দিত না, অথচ তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে কোমল করিয়া তুলিত। আলোছায়ার এই সূক্ষ্মলীলা সকলের চোখে পড়িত না, সাধারণের চোখে অক্ষয় দত্ত নীরস, চারুপাঠ দুরূহ।

চারুপাঠে রস আছে, কিন্তু রসিকতা নাই। অক্ষয় দত্তের রসিকতার নমুনা অন্যত্র হইতে তুলিয়া দিলাম। তিনি একজন বন্ধুকে লিখিতেছেন—

"আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।"

আবার রাজনারায়ণ বসুর মাথা-ঘোরা ব্যাধির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে লিখিতেছেন—

"আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম, তথায় মাথা-ঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিছু তন্ত্র-মন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ......আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের রস পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন......আর নিজে হইতে কোনমতে মাথা ঘোরাইবেন না।"

এই হাসি জ্ঞানের দীপ্তি। অক্ষয় দত্তর প্রতিভা ও হাসি, দুরূহতা ও সরসতা দুইয়েরই উদ্ভব মস্তিষ্কে। এমন বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী লেখক বাঙলা দেশে বিরল। যুক্তিপন্থা ব্যতীত অন্য পথ তাঁহার চোখে পড়িত না বলিলেই চলে। কতক পরিমাণে তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌত্রে আসিয়া বর্তিয়াছে। সত্যেন্দ্র দত্তর Satire-এ বুদ্ধিদীপ্ত হাসির ভাস্বরতা আছে, তাঁহার

সর্বশ্রেষ্ঠ যে শক্তি, নূতন নূতন ছন্দ-রচনার ক্ষমতা, তাহারও উদ্ভব মস্তিষ্কে। জ্ঞান-গরিমায় তাঁহার শেষ বয়সের কবিতার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম।

অক্ষয় দত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী। রামমোহন ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্যে জ্ঞানমার্গী, মহেন্দ্র সরকার পরোপকারের উদ্দেশ্যে জ্ঞানমার্গী, ডিরোজিওর ছাত্রগণ আত্ম-বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানমার্গী ; কিন্তু অক্ষয় দত্তর জ্ঞানমার্গ বিচরণের কোন ইতর উদ্দেশ্য ছিল না। নিছক জ্ঞানের জন্যই তিনি জ্ঞানমার্গের পথিক। বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানকে আয়ত্ত করিবার 'আগ্রহে তাহার সব প্রাণ-মন-কায় একখানি মাথা হয়ে ধরিবারে ধায়।' তাঁহার অস্তিত্বের মধ্যে যেন একটি ওই মস্তকমাত্র ছিল, আর ছিল গোঁফ জোড়ার পাশে একটুখানি হাসির চমক—সে ওই জ্ঞানেরই প্রতিফলনে।

এহেন ব্যক্তির সহিত যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহাতে দুজনেরই সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় ; একজনের স্নেহজাত সহিষ্ণুতা, অপর জনের শ্রদ্ধাজাত। দুজনের মনের মিল ছিল, কিন্তু মতের মিল ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

বাস্তবিক, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অক্ষয়কুমারকে স্বমতে আনয়ন বড় সহজ হয় নাই, আদৌ সম্ভব হইয়াছে কি? বরঞ্চ অক্ষয়কুমারই যেন দেবেন্দ্রনাথকে স্বমতে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—

"এই কালের মধ্যে অক্ষয়বাবু আর একটি মহৎ কার্য্য সংসাধন করিয়াছিলেন, যেজন্য তাঁহার নাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানত তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুলোচনে প্রবৃত্ত হন।......তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"

এই ঘটনাতেই জ্ঞানমার্গী অক্ষয় দত্তের চরম জয়, কারণ গুরুতুল্য আচার্য্যকে তিনি স্বমতে আনিয়া ফেলিলেন ; আবার এই ঘটনাতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম পরাজয়, কারণ বেদান্ত ভ্রান্তই হোক, আর অভ্রান্তই হোক, ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার একটা সুদৃঢ় ভিত্তি পাইয়াছিল, এরূপ ভিত্তি না পাইলে কোন ধর্মের পক্ষে সার্থকভাবে টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। বেদান্তধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম আত্মানুভূতির উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিছক আত্মানুভূতির নজিরে জীবন গঠন করা

চলিতে পারে, সমাজগঠন চলে না। ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি খানিকটা শিথিল হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় পরাজয়ের আঘাত আসিল যেদিন কেশব সেন 'হিন্দু নই' বলিয়া স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ভিত্তির প্রায় সবখানিই ধ্বসিয়া গেল। হিন্দুসমাজ ও বেদান্তকে অস্বীকার করিয়া কোন ধর্ম টিকিতে পারে নাই, বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত হইয়াছে।

প্রত্যেক মতবাদের আতিশয্যের মধ্যেই তাহার মৃত্যুবীজ নিহিত থাকে। অক্ষয় দত্ত যুক্তিবাদীদের এক সভা স্থাপন করিয়া তাহাতে ভোটের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে লাগিলেন। এই সভাতে প্রথমে একজনে প্রস্তাব করিত যে, ভগবান জ্ঞানস্বরূপ ; তখন স্বপক্ষে-বিপক্ষে সভ্যেরা হাত তুলিত, হাতের সংখ্যা গুণিয়া স্থির হইত ভগবান জ্ঞানস্বরূপ অথবা নন। অপর একজন বা প্রস্তাব করিত যে, ভগবান আনন্দস্বরূপ; সেই প্রসঙ্গে আবার ভোট গ্রহণ হইত। এইরূপে যুক্তিবাদের পরিণামে ভগবান ভোটের বস্তু হইয়া উঠিলেন। এই সভাটির নাম যে দশচক্র ছিল না, এমন স্পষ্ট উল্লেখ পাই নাই।

জ্ঞানমার্গী বা মস্তিষ্কবাদী অক্ষয় দত্ত বেদান্তের ভ্রান্ততা প্রমাণ করিয়া ভগবৎবিচারে ভোটের অভ্রান্ততা অবধি আসিয়া পড়িয়াছেন—আর অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। সমস্ত আতিশয্যের উপরে প্রকৃতির একটা অভিশাপ আছে ; মস্তিষ্কবাদের বাড়াবাড়ির উপরে প্রকৃতির আঘাত নামিল। অক্ষয় দত্তের মাথার ব্যায়রাম দেখা দিল ; জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর তিনি শিরোরোগে ভুগিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড কাণ্ড।"—এই ভাবটিই অক্ষয় দত্তের সমস্ত রচনার ধুয়া। ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া দিত। কিন্তু এ বিস্ময় কবির বা ধার্মিকের বিস্ময় নয়, এমন কি, দার্শনিকের বিস্ময়ও নয়, নিতান্তই জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়। ফরাসী মনীষী পাস্কালের একটি উক্তি আছে যে, মহাকাশের ভীমশূন্যতা তাঁহাকে ভীত করিয়া তোলে। এই ভয়ের মধ্যে এক প্রকার mystic অনুভূতি আছে, অজানার ঘোমটা কাঁপার রহস্য আছে, কিন্তু অক্ষয় দত্তের ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড দীপ্ত মধ্যাহ্নের জগৎ, তাহার সবটাই সমান দৃশ্যমান, তাহাতে ছায়াতপ নাই, রহস্যের ছায়ামাত্র ফেলিতে পারে, আকাশে এমন মেঘের লেশমাত্র নাই। তবু এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। এ কোন্ শ্রেণীর বিস্ময়। ঘড়ি দেখিয়া ছোট ছেলের যে বিস্ময়, অক্ষয় দত্তর বিস্ময় সেই শ্রেণীর। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কাছে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ির বেশি নয়। ভগবান অলৌকিক ঘড়িওয়ালা, খুব সম্ভব ডেভিড হেয়ারের একটা স্বর্গীয় সংস্করণ ; তবে ডেভিড হেয়ারের সহৃদয়তা এই স্বর্গীয় ঘড়িওয়ালাতে না থাকিবারই সম্ভাবনা। সত্যই 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড কাণ্ড!' এত প্রকাণ্ড যে তাহার মধ্যে অক্ষয় দত্তেরও স্থান রহিয়াছে।

অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগরের বাঙলা রচনা বিষয়ে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন ; দুজনের স্টাইলকেই উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে, এসবই সত্য। কিন্তু দু'জনের রচনার আসল প্রভেদ এই যে, অক্ষয়কুমারের ভাষায় পূর্বোক্ত জ্ঞানমার্গের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। মধ্যাহ্নদীপ্ত তাঁহার জগতে

ছায়া নাই, ভাষায় ধ্বনির উচ্চাবচতাজাত বৈচিত্র্য নাই, ছোট বড় দূর নিকট সকলের উপরেই তাহার সমান গুরুত্ব, অল্প পড়িলেই ক্লান্তি আসে, অথচ বিশ্রামের ছায়ানিকুঞ্জের অভাব। একমাত্র চন্দ্রলোকের মরুভূমির সঙ্গেই তাঁহার স্টাইলের তুলনা চলিতে পারে; পৃথিবীর মরুভূমি সর্বত্র সমান নীরস নয়, মাঝে মাঝে মরূদ্যান আছে। অক্ষয় দত্তর স্টাইল এক প্রকার গদ্যপয়ার; তাহার শক্তি একান্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাহা একান্ত শক্তিমান। বিদ্যা-সাগরের ভাষা পার্বত্য জগৎ, পথ দুরারোহ, পাথর কঠিন, ভাষা দুরূহ চড়াই আকাশমুখী, উৎরাই পাতালমুখী, ক্লান্তি অগাধ, কিন্তু বিশ্রামের কুঞ্জবনের অভাব নাই, রৌদ্র প্রখর কিন্তু ছায়াও বিরল নয়, পাহাড় উচ্চ কিন্তু সুগভীর উপত্যকা জনপদখানিকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহারই একান্তে উদ্গত-অশ্রু বনবাসিনী জানকীর মতো ঝর্ণাধারা নিরন্তর স্বগত বিলাপ করিয়া মরিতেছে। এই ঝর্ণাতলায় একবার বসিবার আশায় উৎকট চড়াই ভাঙিতে কে না রাজি হইবে? বিদ্যাসাগরের ভাষাই প্রথম বাঙলা স্টাইল। অক্ষয় দত্তর ভাষাকে স্টাইল বলা বৃথা, তাহা স্টাইলের খসড়ামাত্র। বিদ্যাসাগরের ভাষা গদ্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তাহাতে হৃদয়াবেগের যথেচ্ছ যতিপাত আছে; অক্ষয় দত্তর গদ্যপয়ারে হৃদয়াবেগের উত্থান-পতন নাই, ধনুকের টঙ্কারের মতো তাহাতে একপ্রকার শুষ্ক কঠিন শব্দমাত্র ধ্বনিত হয়।

রাজনারায়ণ বসু

বাঙালী হাস্যবিস্মৃত জাতি কিনা জানি না, তবে উচ্চহাস্যবিস্মৃত যে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে উদার উচ্চহাস্য বাঙালীসমাজের স্বভাবগত ছিল, এখন সে মুচকি হাসিতে মাত্র অভ্যস্ত। গত পঞ্চাশ বৎসরে তাহার পূর্বতন উচ্চহাস্য বর্তমান মুচকি হাসিতে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনে মজ্জাগত একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। হাসিতে সমাজের অবস্থা যেমন প্রতিধ্বনিত হয়, এমন আর কিছুতেই নয়, অশ্রুতেও নয়, কারণ অশ্রু চিরন্তনের পরিচয়। এক সময়ে একটা কারণে অশ্রুপাত করিতাম, এখন করি না, এমন হয় না। কিন্তু হাসির বেলায় এ নিয়ম খাটে না। দাশরথির পাঁচালীতে এক সময়ে মানুষে হাসিত, এখন বিরক্ত হইবে। হাসি সামাজিক মনের উচ্ছ্বাস, সে তুলনায় অশ্রু নিতান্ত ব্যক্তিগত। উনবিংশ শতকের বাঙালীসমাজও উচ্চহাস্য করিতে জানিত, এখন সে মুচকি হাসে মাত্র। সেকালে তাহার অন্তরের টাঁকশাল হইতে রাশি রাশি রজত শুভ্র হাসি অজস্রধারে বর্ষিত হইয়া ঘরের দেয়াল ও মেঝেকে ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া তুলিত, এখন তাহার অর্দ্ধব্যক্ত হাসিটি ওষ্ঠাধরের ঈষন্মুক্ত money bagটিতে সঙ্কোচে দেখা দিয়াই আত্মগোপন করে। উদার বাঙালী সহসা কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে—এই পরিবর্তনটি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক প্রচুর উচ্চহাস্যের মূলে একটি উদারতা আছে, একটি স্থূলতা আছে, স্থূলতা একপ্রকারের উদারতা। এই উদারতা আবার সামাজিক মনের লক্ষণ। গত পঞ্চাশ বছরে বাঙালী কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে; আর্থিক কৃপণতা নয়, অর্থের পরিমাণ বোধ করি তাহার বাড়িয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বাঙালী Cynic বা নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। Cynic স্বভাব-কৃপণ, কোন কিছুকেই সে পূরা বিশ্বাস করে না। পরকাল এবং ইহকাল দুই সম্বন্ধেই তাহার সমান সংশয়। এ যুগের শিক্ষিত বাঙালীর যথার্থ প্রতিনিধি অমিত রায়। তাহাকে উচ্চহাস্যের অপরাধ কেহ দিতে পারিবে না। অপরকে আনন্দদানের আশায় সে কখনো অট্টরবে হাসিয়া ওঠে না, উচ্চহাস্য পরমুখাপেক্ষী। অমিত রায় দুঃখে হাসে, তাহার হাসির উদ্দেশ্য অপরকে আঘাত দান।

সেকালের বাঙালীর উনবিংশ শতকের প্রতিনিধি রাজনারায়ণ বসু। তিনি হিন্দু কলেজের উচ্চশিক্ষিত, ইংরাজিতে কৃতবিদ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে 'ইংরেজি খাঁ' বলিতেন; তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, এসব বিচার করিলে তাঁহাকে বাঙালীসমাজের প্রতিনিধি বলা চলে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উচ্চহাস্যের মানদণ্ডে মাপিলে তাঁহাকে তৎকালেই বিলীয়মান, এখন সম্পূর্ণ বিলীন, বাঙালীসমাজের মানুষ বলা উচিত। সেকালের চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা, বারোয়ারীতলা উচ্চহাস্যের নায়েগ্রা প্রপাত ছিল। মুকুন্দরামের অঙ্কিত ভাঁড়ু দত্ত উচ্চহাস্যপ্রবণ

ছিল: তাই সে গ্রামের মোড়ল মাত্র নয়, বাঙালীসমাজের মোড়ল। সাধু রাজনারায়ণ বসু আর অসাধু ভাঁড়ু দত্তে মূলগত একটা ঐক্য ছিল—হৃদয়াবেগের উদারতার ঐক্য। উনবিংশ শতকের কলিকাতার বৈঠকখানার জাজিমপাতা যে শুভ্র ফরাস, আজ তাহা গ্রহান্তরের রিক্ত শুভ্র সুদূর প্রান্তরের মতো বোধ হয়, বৈঠকখানার সে উচ্চহাস্য আজ কাহিনী কিম্বদন্তীর মাধ্যমে ক্ষীণ প্রতিধ্বনিরূপে মাত্র কখনো কখনো ভাসিয়া আসে—কিন্তু সে সমস্তই যেন লোকান্তরের ব্যাপার, আমাদের অন্তরকে আর স্পর্শ করে না—বড় জোর কৌতূহল মাত্র জাগ্রত করে। রাজনারায়ণ বসু ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চ দ্বৈত হাস্য বাংলা সাহিত্যের একটি অতীত অধ্যায়কে এখনো মর্মরিত করিতেছে, জীবনস্মৃতির পাঠকদের তাহা ভুলিবার নয়।

রাজনারায়ণ বসু সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্র। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তিনি গোল-দীঘিতে বসিয়া প্রকাশ্যে সুরাপান করিতেন। এখন যেখানে সিনেট হাউস, সেখানে মুসলমানের শিক-কাবাবের দোকান ছিল, শিককাবাব কিনিয়া আনিয়া খাইতেন। কুসংস্কার ছেদনরূপ আদর্শ স্থাপনের আশাতেই তাঁহারা এ দুটি কার্য্য করিতেন, পাছে আদর্শস্থাপনে কালব্যাজ ঘটে তাই লোহার রেলিং টপকাইয়া যাইতেন, দরজা দিয়া ঘুরিয়া যাইবার সবুর সহিত না। আদর্শের গরজ বড় গরজ। আদর্শের খাতিরে মদ ধরিলে ছাড়ানো বড়ই কঠিন।

তবু রাজনারায়ণ বসু মদ ছাড়িলেন, সমাজসংস্কারের প্রেরণায় দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, দুটি ভাইয়ের বিধবা বিবাহ দিলেন; সমাজ তাঁহাকে ছাড়িল, তিনি সমাজ ছাড়িলেন না। তখন সমাজে দুইটি বিপদ ছিল। একদল ইংরাজি শিক্ষিত খৃষ্টান হইয়া সমাজ ছাড়িল, আর উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ দেবেন্দ্রনাথের হিন্দু সমাজঘেঁষা ব্রাহ্মসমাজে সন্তুষ্ট না থাকিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহাদের কর্মপ্রণালীর অনিবার্য্য logic শেষে তাঁহাদের এমন স্থানে আনিয়া ফেলিল যে, 'হিন্দু নই' একথা স্বীকার করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। রাজনারায়ণ বসু এ দুইয়ের একতরের সঙ্গেও ভিড়িলেন না, তাঁহার শিক্ষার পূর্বেতিহাস বিচার করিলে ইহা কি বিস্ময়জনক নয়? তিনি (আদি) ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুসমাজঘেঁষা হইয়াই রহিলেন।

কেন এমন হইল? এই প্রাচীন দেশের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি-ইতিহাসের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দরদ ছিল। এ বস্তু যে কত সুমহৎ, ইহার শিকড় যে কত সুদূরপ্রসারী, এ সত্য যে একবার অনুভব করিয়াছে, ইহাকে ত্যাগ করিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। রাজনারায়ণ বসু এক সময়ে কিছুকাল কানপুরে ছিলেন। তখন তাঁহার কৌতূহল হইল, পিতৃভূমি দর্শনের। কনোজ বাঙালী পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের পিতৃভূমি বলিয়া কথিত। তিনি ভূদেববাবুকে সঙ্গী পাইলেন। দুইজনে কনোজ গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার এমনি ভালো লাগিল যে, বাঙালী-সমাজের পূর্বপুরুষদের গৌড়যাত্রা কল্পনায় দেখিতে পাইলেন। ব্যাপারটা শুনিয়া তুমি একটুখানি মুচকি হাসিবে, বলিবে পাগল। ওই অভিযোগটি শুনিলে রাজনারায়ণ বসু ঘরের কড়িকাঠ অবধি প্রকম্পিত করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, বলিতেন পাগল বই কি! এই পিতৃভূমি দর্শনের ইচ্ছা

দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে তলাইয়া যাইবার ইচ্ছা ছাড়া আর কি! তাঁহার 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব', 'বৃদ্ধি হিন্দুর আশা' 'জাতীয় গৌবব প্রচারিণী সভা' (যাহার ফলে হিন্দু মেলা) প্রভৃতি রচনা ও বক্তৃতাতেও ওই একই ইচ্ছা—দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় সত্তার সহিত জ্ঞান ও ভক্তির যোগ স্থাপন। তিনি ভিন্ন সমাজভুক্ত হইলেও সাধারণ লোকে প্রচ্ছন্নভাবে বুঝিত যে তিনি তাঁহাদেরই একজন, তাই লোকে তাঁহাকে বলিত 'কলির ব্যাস', দেওঘরের পাণ্ডাগণ তাঁহাকে বলিত 'দোসরা বৈদ্যনাথ'। এমন লোক যদি দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় না হইবেন তবে আর কে হইবে? ওই উচ্চহাস্যের সূত্রে তিনি বাঙলাদেশের প্রতিনিধি—তাই এদেশের সামাজিক মন এমন অনায়াসে তাঁহার কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু ওইখানেই বুঝি তাহার শেষ। উচ্চ-নিখাদে বাঁধা বহুকালের এই তন্ত্রীটি হঠাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নূতন শিক্ষার, নূতন ধর্মের Puritanism-এর ফলে বাঙলাদেশ হইতে প্রাণখোলা হাসির নির্বাসন হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে হাসির এখন আর সে দরজা-ভাঙা প্রতাপ নাই; এখন সে অতিশয় মার্জিতবেশে নিঃশব্দে আসে, হাসির সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামটি বিলি করে, তারপরে শিষ্টভাষণটুকুমাত্র না করিয়া চলিয়া যায়, তাহার গায়ে ধূলাটুকু লাগে না। একি হাসি! মাটির উপরে যেখানে পৃথিবীর ফলস্টাফ, ডনকুইকসট্, পিকউইক, ভাঁড়ুদত্ত হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে, রাজনারায়ণ বসুর সেখানে স্থান। সেই মাটির স্বর্গ এক সময়ে সমস্ত বাঙালী জাতিটার রাজসিংহাসন ছিল। আজ নাস্তিকের সূক্ষ্ম হাসির তীক্ষ্ণ শূলের উপরে আমরা বিরাজ করিতেছি। তাই এত বেশি করিয়া রাজনারায়ণ বসুকে মনে পড়িতেছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষা ও আত্মিক প্রযত্ন দুটি পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই বিরাট দেশের প্রদেশগুলিকে অতিক্রম করিয়া যে ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের উপলব্ধি একটি। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ অবধি বাঙালী মনীষিগণ নূতন ভাবে মহাভারতাদি পুরাণোক্ত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার ও উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমে ইহা কেবল আত্মিক উপলব্ধিতেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু কালক্রমে আত্মার সত্যকে বাস্তবের স্তরে নামাইয়া আনিয়া তাহাকে রাজনীতি ও সমাজ-নীতির কঠিন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছিল। এই আবিষ্কৃতি কলম্বাসের নূতন জগৎ-আবিষ্কারের চেয়ে অধিকতর গৌরবে পূর্ণ, কারণ কলম্বাসের আবিষ্কার একটা ভূখণ্ড মাত্র, তদধিক কিছু নয়। আর পূর্বোক্ত আবিষ্কারের ফলে নূতন একটা তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষ যেমন একটা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা, তেমনি বা তাহার চেয়েও বেশি ভারতবর্ষ বলিতে একটি বিশেষ জীবন-দর্শন বুঝায়। এই জীবন-দর্শনকে লোকে ভুলিতেই বসিয়াছিল। পুরাণে রহিয়াছে বলিলে আবিষ্কারের গৌরব কমে না, কারণ আবিষ্কার মানেই বিস্মৃত বা অজ্ঞাত সত্যের পুনরুদ্ধার। কলম্বাস অবশ্যই আমেরিকার সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আবিষ্কার প্রায় সৃষ্টিরই সমতুল্য।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় আত্মিক প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যের বরণীয় সম্পদগুলিকে ভারতের রক্ষণীয় সম্পদগুলির সহিত মিলাইয়া লইয়া একটা নূতন কালচারের সৃষ্টি। প্রতীচ্যকে গ্রহণ এবং প্রাচ্যকে রক্ষণ—এই দুইয়ে মিলাইয়া একপ্রকার রক্ষণমূলক প্রগতিবাদের সাধনা তখনকার সমস্ত বাঙালী মনীষীকে প্রচণ্ড আবেগে নাড়া দিয়াছিল। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, এই সমন্বয় কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়; তাঁহাদের মনে হইয়াছিল একমাত্র এই পন্থাতেই ভারতবর্ষের চিত্তলোকের জড়তা কাটিয়া জাগরণ দেখা দিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সাধনা এবং বাঙলার দৃষ্টান্তে অনেকাংশে ভারতের সাধনা, মূলতঃ এ দুটি পন্থা (বস্তুতঃ পন্থা একটিই) অনুসরণ করিয়া সার্থকতা লাভের প্রয়াস করিতেছিল।

কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, বাঙলার বিংশ শতাব্দী এবং অনেকাংশে ভারতেরও বটে, উনবিংশ শতাব্দীর এই সাধনাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিয়াছে। এই চ্যালেঞ্জ এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃই অধিকতর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া চোখে পড়িতেছে। এখন আমাদের কাছে দেশের চেয়ে প্রদেশ বৃহত্তর সত্তা, এখন ভারতবর্ষ বলিতে আমাদের মন আর তেমন করিয়া নাড়া খায় না, ভারতসঙ্গীত এখন বঙ্গসঙ্গীত! মোটের উপর ভারতবর্ষ আমাদের কাছে একটা অস্পষ্ট কুয়াসার চেয়ে অধিক কিছুই নয়। মিঃ জিন্নার পাকিস্থানলাভ ভারতবর্ষ-

উপলব্ধির পরিপন্থী সত্যরূপে বিংশ শতাব্দীর মনে দেখা দিয়াছে। সকল প্রদেশেই প্রদেশসত্তা উগ্রতর আকারে দেখা দিতেছে। আর স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে দেশশাসন-সম্পর্কিত অবশিষ্ট ক্ষমতা residuary powers প্রদেশগুলির হাতেই যদি সমর্পিত হয়, তবে যাহাদের মাথায় প্রাদেশিকতার ভূত চাপিয়াছে, সেই প্রদেশগুলির হাতে শাসনতন্ত্রবহির্ভূত অনির্দিষ্ট ক্ষমতা আসিয়া পড়িলে তাহা যে প্রাদেশিকতার অনুকূলেই ব্যবহৃত হইবে, তাহা নিতান্ত অনভিজ্ঞেও বলিতে পারে। ইহার পরিণাম স্মরণ করিতেও ভয় হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির অক্ষমতার সুযোগ লইয়া প্রদেশগুলির ক্ষমতার অপব্যবহার এবং তাহার ফলে সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা যতই বাড়িবে, ভারতীয়ত্ববোধ ততই কমিবে, ভারতীয়ত্ব-বোধ যতই কমিবে, ভারতবর্ষ বলিতে যে জীবন-দর্শন বুঝায়, উনবিংশ শতাব্দী যাহার আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহার উপরে মানুষের আস্থা ততই লোপ পাইবে। পরিণাম রাষ্ট্রিক ও আত্মিক অরাজকতা। বিংশ শতাব্দী সেই পথেই চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সিদ্ধান্ত আজ হীনবল।

আবার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ে নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি; তাহারও বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উত্থিত হইয়াছে। এই চ্যালেঞ্জের প্রবর্তক স্বয়ং গান্ধীজী। গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমান খাঁটি মুসলমান হইলে, হিন্দু খাঁটি হিন্দু হইলে তবেই তাহাদের মিলন সম্ভব। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া বলা চলে পাশ্চাত্য খাঁটি পাশ্চাত্য হইলে, প্রাচ্য খাঁটি প্রাচ্য হইলে তবেই তাহাদের প্রকৃত মিলন হইবে। গান্ধীজীর এই প্রস্তাব এবং উনবিংশ শতাব্দীর সিদ্ধান্ত মূলতঃ ভিন্ন। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, পুরাতন সিদ্ধান্ত দুটিই আজ অনাদৃত ও অকর্মণ্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বিংশ শতাব্দী নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং যথোচিত ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের সাহায্যে নূতন সিদ্ধান্ত এবং নূতন সমন্বয় সন্ধান করিতে শুরু করিয়াছে।

কিন্তু এ সব তো পরের কথা; এবারে আগের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা স্বভাবতঃই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দুটিকে অভ্রান্ত মনে করিয়াছিলেন, মনে করিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন। সে যুগের অধিকাংশ মনীষী কোন না কোন আকারে এই সাধনার অনুকূলে পরিশ্রম করিয়াছেন। বাহ্যতঃ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণায় প্রভেদ থাকিতে পারে, অনেক সময়েই গুরুতর প্রভেদ ছিল, কিন্তু মূলে ভেদ ছিল না। সকলেই সগোচরে এবং কখনো কখনো নিজেরও অগোচরে স্ব স্ব প্রযত্নের দ্বারা মূল সাধনপ্রবাহকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মূল ধারার অনুগামী মনীষিগণই এই চিত্র-চরিত্র পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতিকূল মনে হইয়াছে স্বভাবতঃই এই পর্য্যায়ে তাঁহাদের স্থান হয় নাই। বাঙলার ইতিহাসেও তাঁহাদের স্থান হইবে কি না সন্দেহ!

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্মজীবন মূল ধারার অনুগ। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে আত্মার নাবিকদল ভারত-আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অচিত্রিত সমুদ্রে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল,

ভূদেব তাঁহাদের অন্যতম। ভারতবর্ষ বই তিনি কিছু জানিতেন না, ভারতবর্ষই তাঁহার সাধ্য ও সাধনা ছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান এই সাধনার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু যদি তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান মাইকেল মধুসূদনের চেয়ে কিছুমাত্রও অধিক না হইত তৎসত্ত্বেও তাঁহার ভারত-সাধনা ক্ষুন্ন হইত না। কারণ তখন হাওয়াটাই ভারতমুখী বহিতেছিল, যে-ঘাটে যাইবার আশাতেই পাল তুলিয়া দাও না কেন সকলকেই ওই একই ঘাটে লইয়া গিয়া ফেলিত। কথিত আছে যে, একবার ভূদেব সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুর সহিত বাঙলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের 'আদি পিতৃভূমি' কনৌজ দেখিতে গিয়াছিলেন। ব্যাপারটাকে নিছক পাগলামি বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু এই madnessএর মধ্যেও method ছিল, পুরাতন ভারতবর্ষের ছিন্নপ্রায় সূত্রটাকে আবিষ্কারের চেষ্টা। রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব, মাইকেল, কেশব সেন, বিবেকানন্দ—পরস্পরে কত প্রভেদ। কিন্তু একটা জায়গায় সকলেই এক, সকলেই ভারত-নাবিক।

ভূদেব ভারতবর্ষকে একদেশ ও স্বদেশ মনে করিতেন। এই বিচিত্রভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে এই প্রশ্ন ভূদেবের মনে জাগিয়াছিল এবং স্বয়ং একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখক হইয়াও বিনা দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন যে, হিন্দী-হিন্দুস্থানীই রাষ্ট্রভাষা হইবার অধিকার রাখে।

"ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।"

—সামাজিক প্রবন্ধ

অপিচ—"আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজির ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভালো।" —সামাজিক প্রবন্ধ

দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় করিবার আশায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত সন্তান ভূদেব বহুদূর যাইতে রাজি ছিলেন।

"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশনির্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দী ভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে, এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।" —সামাজিক প্রবন্ধ

ভূদেবের এই অভিমত কেবল চিন্তায় পর্য্যবসিত ছিল না, সাধ্যানুসারে কাজে রূপান্তরিত করিতেও তিনি পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার জীবনী-লেখক বলিতেছেন যে,—"তিনি বিহারে দীর্ঘকাল স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। এই অঞ্চলে হিন্দীর প্রসারকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি নানাস্থানে বহু আদর্শ হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দী বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ (ভূদেবের মতে ১০।১৫ গুণ) বর্দ্ধিত হয়।

হিন্দী পুস্তকাদি প্রণয়নব্যাপারেও ভূদেবের কৃতিত্ব কম নহে। তিনি ইংরাজি পুস্তকের পরিবর্তে অনেক উৎকৃষ্ট বাঙলা পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে বিহারের আদালতসমূহে ফার্সির পরিবর্তে হিন্দী প্রবর্তিত হয়।" ভূদেবের নিজের মতে তাঁহার জীবনের "ক্ষুদ্র কর্মগুলির" মধ্যে এইটি সর্বপ্রধান। বিহারবাসীরাও ভূদেবের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন না। ভূদেবের গুণকীর্তন করিয়া তখন একাধিক হিন্দী গান লিখিত হইয়াছিল। একটির কিয়দংশ প্রদত্ত হইল :—

"ধন্য ধন্য গভর্ণমেণ্ট। পরজা সুখদায়ী।
জামনীকে * দূর করী। নাগরী চলাই ॥
'ভুবন দেব' করি পুকার। লাট নিকট জাই ॥
'পরজা দুঃখ' দুর করহ। জামনী দুরাই ॥"

আধুনিক বাঙলা দেশ ভূদেবের জীবনের এই মহত্তম কীর্তিটিকে ভুলিয়াছে, কারণ আধুনিক বাঙলা দেশ মনে মনে প্রাদেশিকতায় বিশ্বাসী যদিচ সভায় সমিতিতে এখনও "জনগণমন" গানটি গীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ এখন আমাদের সভার বিষয়, ঘরের বিষয় নয়, মনের বিষয় তো নয়ই। আধুনিক বাঙালীর কাছে বাঙলা দেশ ভারতবর্ষের চেয়েও বৃহত্তর, সেইজন্যই এক শ্রেণীর ব্যক্তি বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভূদেব বিস্মৃতপ্রায়। আরও বিপদ এই যে, প্রলয়-প্লাবনের জল প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। Noahs'ark তৈয়ারি করিবার সময়ও বুঝি গত। সে যুগের মনীষীদের মাথা একে একে ডুবিয়া যাইবে, তখন সেই জলের রিক্তপটের উপরে আবার হয়তো নিষ্ঠুর শিল্পীর নূতন তুলি চলিতে থাকিবে।

* যাবনিক ভাষা

রামতনু লাহিড়ী

ব্যক্তিত্ব দুই শ্রেণীর, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় ব্যক্তিত্ব কর্ম ও চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করে, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশের মাধ্যম সন্ধান করে না, সে স্বতঃপ্রকাশ। ফুল যেমন আপনার সৌগন্ধের একটি পরিমণ্ডল রচনা করিয়া বিরাজ করে, তদতিরিক্ত তাহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, তাহার গন্ধ-দূত মৌমাছি ও রসিকজনকে আকর্ষণ করে, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বও অনেকটা সেই রকম। আর বৃক্ষকে সক্রিয় ব্যক্তিত্ববান বলা যাইতে পারে; গাছটি ফুল ফোটায়, ফল দান করে, ছায়ার আশ্রয় বিছাইয়া দেয়—ফুলে ফলে ছায়াতে তাহার ব্যক্তিত্ব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এগুলি যেন তাহার এক প্রকার মুখরতা।

মানুষের সমাজে সচরাচর এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের আধার, তাহা প্রভূত পরিমাণে তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে, কতকটা বা তাহার সামাজিক পরিবেশের উপরে নির্ভরশীল। করা এবং হওয়া, এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে-ব্যক্তি বা যে-সমাজ একতরকে শ্রেষ্ঠতর মনে করে, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব সেইভাবে অল্পাধিক ফুটিয়া ওঠে। এবিষয়ে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম টানা চলে না। তবে কাজ-চালানো গোছের একটা নিয়ম খাড়া করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ করার চেয়ে হওয়াকেই বড় মনে করে, ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর ঝোঁক করার দিকে। আবার আরও এক প্রকারে এই নিয়মের প্রয়োগ সম্ভব। মধ্যযুগের আদর্শ ছিল—হওয়ার দিকে, রেণেসাঁস-পরবর্তী যুগের সাধনা যেমন করার দিকে, তেমন হওয়ার দিকে নয়। রেণেসাঁসের হাওয়া যে দেশে লাগিয়াছে সমাজ যেন জাগিয়া উঠিয়া সক্রিয় হইয়াছে—কিছু করিতে হইবে—সম্ভব হইলে বড় কাজ করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাহার আদর্শ; বড় কাজ করার ঝোঁকে বড় হওয়ার কথা সে অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় রেণেসাঁসের সন্তানদের অনেকেরই ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুকরণীয় নয়, কিন্তু যে-সব মহৎ কার্য্য তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত স্মরণ করিয়া রাখিবে। রেণেসাঁস-জীবন-ধর্মের দুর্বলতা ওইখানে। হওয়া ও করার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আপনি বড় না হইলেও বড় কাজ করা সম্ভব বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। বেকনকে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া কেহ মনে করিবে না, কিন্তু তাঁহার মহৎ চিন্তাকে স্বীকার না করিয়া উপায় কি?

এদেশ প্রধানতঃ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের দেশ হইলেও ইংরাজিশিক্ষার হাওয়া লাগিয়া তাহার একটা শাখা ফুলে ফলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের পাশে পাশে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিতে লাগিল। আমাদের দেশে অগাধ জ্ঞানবান্ পুরুষের অভাব

কোনকালেই ছিল না—কিন্তু অধিকাংশই তাঁহাদের বিদ্যার স্বরূপ-চিহ্ন না রাখিয়া অন্তরিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিবেন প্রয়োজন কি? তাঁহারা বলিবেন এই যে জানিলাম, জানার দ্বারা এই যে পূর্ণতা অনুভব করিলাম—তাহাই কি যথেষ্ট নয়? ইংরাজিশিক্ষার হাওয়া পাইয়া এদেশের মনীষীরা আর তাহাকে যথেষ্ট মনে করিতে পারিলেন না। ব্যক্তিত্বের নিষ্ক্রিয়তাকে তাঁহারা একপ্রকার অপূর্ণতা বলিয়া মনে করিলেন, মনে করিয়া বড় হওয়ার প্রচলিত গণ্ডী ছাড়িয়া তাঁহারা বড় কাজের প্রশস্ততর আসরে অবতীর্ণ হইলেন। রামমোহন এই ধারার, যেমন অন্যান্য অনেক ধারার, প্রবর্তক। অপরপক্ষে বলা যাইতে পারে বড় কাজ করিবার ঝোঁকে তাঁহাদের দৃষ্টি বহুল পরিমাণে নিজের দিক হইতে বাহিরের দিকে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে অবশ্যম্ভাবী ভ্রমত্রুটি রহিয়া গেল। রামমোহন-চরিত্রেও আছে।

বাঙলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজিশিক্ষিত মনীষীদের অধিকাংশই সক্রিয় ব্যক্তিত্ববান—ওইটাই সে যুগের সামান্য লক্ষণ। নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ববান পুরুষ অপেক্ষাকৃত বিরল। এই বিরল সভার যোগ্য প্রতিনিধি রামতনু লাহিড়ী, যোগ্যতম প্রতিনিধি কি না নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। যেকালে বাঙলা দেশের অধিকাংশ মনীষী বিচিত্র কর্মে ও বিচিত্র প্রবন্ধে আপনাদিগকে ব্যক্ত করিতেছিলেন, রামতনু লাহিড়ী তখন বাহ্য প্রয়াস হইতে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন রচনার বা উল্লেখ-যোগ্য কোন কর্মপ্রচেষ্টার বিষয় জানা যায় না, তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমস্ত শিক্ষিতসমাজে অনুভূত হইত। তখনকার ঘূর্ণ্যমান সমাজ-চক্রের কেন্দ্রস্থলে নিতান্ত নিশ্চল থাকিয়াই তিনি আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ওইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য, আবার সে-যুগেরও বৈশিষ্ট্য।

রামতনু লাহিড়ীর জীবনী-লেখক লাহিড়ী মহাশয়ের শ্মশানযাত্রার বর্ণনা করিতেছেন—"যথাসময়ে আমরা বহুসংখ্যক ব্যক্তি নগ্নপদে তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম।......জনতা দেখিয়া লোকে বলে, 'কে যায়', 'কে যায়', উত্তর—'রামতনু লাহিড়ী যান'। অমনি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী—'যা, দেশের একটা সাধু লোক গেল।' রোমের পোপ অনেক খৃষ্টীয় নরনারীকে সাধু উপাধি দিয়াছেন—ইঁহাকে সাধারণ লোকে 'সাধু' উপাধি দিয়াছিল।" তাঁহার জীবনের শিক্ষা প্রসঙ্গেই লেখক পুনরায় বলিতেছেন যে, "ইঁহারা অধিক কিছু না করিলেও যে স্মৃতি রাখিয়া যান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।"

লেখক রামতনু লাহিড়ীর ব্যক্তিত্বের মর্মস্থানে আলোকপাত করিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ী সমাজে তাঁহার সাধুত্বের স্মৃতিটি মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কোন মহৎ কর্ম বা কোন মহৎ চিন্তার সূত্র নয়। ইহাকেই আমরা নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব বলিতেছি। সেকালের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁহার বাহ্য দান বা কৃতিত্ব নগণ্য। তিনি আপনাকেই দান করিয়া-

ছিলেন; এবং আপনার সাধুত্বের স্মৃতিটি মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন—তদতিরিক্ত কিছু নহে, তদতিরিক্ত আর কী-ই বা বাঞ্ছনীয়!

রামতনু লাহিড়ী হেয়ার সাহেবের ছাত্র; হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্র। শিক্ষিত-সমাজে তখন একদিকে নিরীশ্বরবাদ, অপর দিকে খৃষ্ট-ধর্মানুরক্তিতে দড়ি টানাটানি চলিতেছে। রামতনু এ দুইয়েরই আকর্ষণ যে এড়াইয়া গেলেন তার কারণ তাঁহার প্রকৃতির স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় ধর্ম। নিষ্ক্রিয়তা স্বভাবতই মধ্যপন্থী, কোন বিশেষ দিকে সে ঝুঁকিতে চায় না। অবশেষে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন বটে—কিন্তু কোন সমাজভুক্ত হইলেন না। এইরূপে তিনি হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজ দুইয়ের বাহিরে থাকিয়াই দুইয়ের অন্তরতর স্থলে প্রবেশ পাইলেন। রামতনু লাহিড়ী কোন সমাজভুক্ত এ প্রশ্ন কাহারো মনে উঠিত না—সবাই জানিত লাহিড়ী মহাশয় সাধুপুরুষ। এমন কি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরাও কেমন করিয়া যেন বুঝিত এ লোকটিকে সাধারণ মানদণ্ডে তৌল করা উচিত হইবে না। রামতনুর জীবনীলেখক একবার কৃষ্ণনগরে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পথের মধ্যে কতকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তাহারা বৃদ্ধ লাহিড়ীকে কি দৃষ্টিতে দেখে যাচাই করিয়া লইবার জন্য লেখক প্রশ্ন করিলেন—"হাঁ হে বাপু, তোমরা কি কৃষ্ণনগরের লোক?"

উত্তর। আজ্ঞে কৃষ্ণনগরেরই বলতে হবে। পাশের গ্রামের।

প্রশ্ন। তোমরা কি রামতনু লাহিড়ীকে জান?

উত্তর। কে? আমাদের বুড়ো লাহিড়ীবাবু? তাঁকে কে না জানে?

প্রশ্ন। তিনি কেমন মানুষ?

উত্তর। তিনি কি মানুষ? তিনি দেবতা।

প্রশ্ন। সে কি হে? পৈতা ফেলা-লোক, হাঁস-মুরগী খান, দেবতা কেমন?

অমনি মানুষগুলি ফিরিয়া দাঁড়াইল। 'কে গো মশাই, আপনি বোধ হয় এদেশের মানুষ নন।'

না বাপু, আমি এদেশের মানুষ নই।

উত্তর। ওঃ তাইতে, আপনি যে-সব বললেন, ওসব করা অন্যের পক্ষে দোষ, ওঁর পক্ষে নয়, উঁনি যা করেন তাই শোভা পায়।

অশিক্ষিত লোকে মহত্ত্বকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারে, যত গোল সমাজের উপরিতলের শিক্ষিতদের লইয়া।

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের একটি চিত্র স্নেহশ্রদ্ধার উপভোগ্য। তিনি শেষ বয়সে যখন কলিকাতায় থাকিতেন মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগিতেন। জ্বর একদিন বাদে আসিত। জ্বরের দিনটা ছিল তাঁহার 'bad day'—আর আরামের দিনটা ছিল 'good day'. কিন্তু সুদিন হোক, আর দুর্দিন হোক, লাহিড়ী মহাশয়ের বিরাম ছিল না, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী বেড়াইতে

যাইবেনই। সঙ্গে থাকিত একটা খাতা আর পেন্সিল, কোন নূতন বিষয় শুনিলে তখনই তাঁহার টুকিয়া লওয়া চাই। লোকে তাঁহার গায়ের বালাপোষ ও দেহের ঈষৎ কম্পন দেখিয়া বুঝিয়া লইত যে রামতনু লাহিড়ীর স্বাস্থ্যের ক্যালেণ্ডারে আজকের দিনটা bad day! এই সাধু-পুরুষটি পরলোকে গিয়া জীবনের সমস্ত সংস্কার নিশ্চয় বর্জন করিয়াছেন—কিন্তু সেই পুরাতন নোটবুক ও পেন্সিল ছাড়িতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেখানে নূতন কিছু দেখিবা-মাত্র খুব সম্ভবতঃ তিনি মলিন খাতাখানিটিতে সব টুকিয়া লইতেছেন। কিন্তু হায় রে! পরলোক কি ইহলোকের মতো চিত্তাকর্ষক! সাধু রামতনু লাহিড়ীর কি এক আধবার কলিকাতার বৈঠকখানাগুলির কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে না?

ফার্ষ্ট বুকের প্যারি সরকার

গত আশী বৎসরের মধ্যে কোন্ ইংরাজিশিক্ষার্থী বাঙালী ছাত্র না প্যারিচরণ সরকারের ফার্ষ্ট বুক পড়িয়াছে ? ওই ফার্ষ্ট বুকের চাবিতেই সকলকে ইংরাজি ভাষার তালা খুলিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকেও এই বইখানা দিয়া শুরু করিতে হইয়াছিল। আবার প্রভাত মুখুজ্জের গল্প হইতে জানিতে পারি যে, সেকালের বালিকারা ফার্ষ্ট বুকের গাধার গল্প পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলে বিবাহের বাজারের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইত। বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও প্যারি সরকারের ফার্ষ্ট বুক দিবারাত্রির মতো বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষাসূত্রপাতকে নিঃশেষে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

ফার্ষ্ট বুকের মতো ফার্ষ্ট বুকের লেখকের ছবিখানাও কে না দেখিয়াছে ! চোগা-চাপকান-পরিহিত স্থূলদেহের উপরে পাট-করা চাদর, এক হাতে বই, মাথায় টাক, প্যারিচরণের মূর্তি সর্বজনপরিচিত। ফার্ষ্ট বুকের প্রথম শিক্ষার্থিগণ সে-মূর্তির প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে সে কথা না তোলাই ভালো—কিন্তু মানিতেই হইবে যে পরবর্তীকালে সকলেই কখনো না কখনো সরকার মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করিয়াছে।

প্যারিচরণ সরকার সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—"তিনি বহুকাল বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপর কলিকাতা হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে কলেজের ছেলেদের জন্য বর্তমান ইডেন হোষ্টেলের অনুরূপ একটি আবাসবাটি স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপান-নিবারণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি অমর কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটি সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে ইংরাজিতে 'well wisher' ও বাংলাতে 'হিতসাধক' নামে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত; তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে প্রতিবাদিত হইত। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কার্য্যের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে সুরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেশের হিত-চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই।"

উপরের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তৎকালে প্যারিচরণ সরকার সমাজ-

সংস্কারকরূপে, সুরাপান-নিবারণের প্রধান উদ্যোক্তারূপে সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সমাজসংস্কার স্রোতের জলে রেখা টানিবার মতো—সমাজের পরিবর্তন হইলেই সংস্কারের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এমন কি বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার গৌরব পর্য্যন্ত আজ লঘু হইয়া পড়িয়াছে। অজেয় পৌরুষের মাহাত্ম্যেই বিদ্যাসাগর অমর হইয়া আছেন, সমাজসংস্কারকরূপে নহে। সমাজসংস্কারকদের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই অমরতার পথ ত্যাগ করেন। ইতিহাসের পাতায় কোন রকমে নামটা থাকিলেই লোককে অমর বলা যায় না—নামটা এমন জীবন্তভাবে থাকা দরকার যাহাতে তাহার প্রভাব লোকসমাজে সক্রিয় থাকে। জাদুঘরে স্থান পইয়াছে বলিয়াই জন্তুজানোয়ারগুলিকে অমর বলা চলে না। অমরত্ব সজীব সত্তা।

সমাজসংস্কারকরূপে বা সুরাপান-নিবারকরূপে প্যারিচরণ সরকার তৎকালে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবীও করিতে পারেন, কিন্তু অমরতার দাবী করিতে পারেন না। প্যারিচরণ সরকার ইংরাজিশিক্ষার প্রধান প্রচারকরূপে অমর হইয়া আছেন। এক সময়ে ইংরাজি শিখিবার আশায় বাঙালী ছেলেরা হেয়ার সাহেবের পাল্কির পাশে পাশে ছুটিত, বলিত "Me poor boy, sir"। হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইলে ছেলেরা ভাবিত ভাবী উন্নতির সদর রাস্তাটার হদিস তাহারা পাইল।

তাহারও আগে—"প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আসেন, সে সময়ে সেট বসাক বাবুরা সওদাগরি করিতেন; কিন্তু কলিকাতার একজনও ইংরাজি ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারা হইত। মানবস্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ইংরাজি কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরাজি চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময়ে রাম রাম মিশ্রী ও আনন্দি রাম দাস অনেক ইংরাজি কথা শিখিয়াছিলেন। রাম রাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৫ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত।···বিবাহে অথবা ভোজের সভায় যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে (compound word বলা) পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহাদিতেন।"

এই গেল ইংরাজিশিক্ষার প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে দৌড়, তৃতীয় অবস্থা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। তখনো ইংরাজিশিক্ষা বাড়ীর বাহিরে ছিল—সাধারণ জলাশয়ের মতো, ঘাটে গেলে তবেই তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব ছিল। প্যারি সরকার ফার্ষ্ট বুক লিখিয়া ইংরাজিশিক্ষার কলের জলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বাড়ীতে বাড়ীতে কলের জল আসিল—একটু কষ্ট করিয়া নলের মুখটা খুলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

ইংরাজিশিক্ষার ফলে এদেশের ভালো ও মন্দ দুই-ই হইয়াছে। একথা যদি সত্য হয় তবে যিনি ইংরাজিশিক্ষার দানসত্র খুলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাকে যথাযোগ্যভাবে স্মরণ করিতে

হয়। ইংরাজিশিক্ষার প্রভাব আমাদের সমাজে এখন পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়, সেই সূত্রে হেয়ার, বেথুন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মেকলের সঙ্গে প্যারিচরণ সরকারের নামও অমর হইয়া আছে, এখনও দীর্ঘকাল থাকিবে। ফার্ষ্ট বুকের মতো সামান্য একখানা পুস্তকের বলে আর কেহ অমরত্বের দাবী করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ! কিন্তু সামান্য একখানা পুস্তক বলা বোধ করি সঙ্গত হইল না, সমাজের একটা প্রচণ্ড প্রবণতার প্রতীক ওই সামান্য বইখানা। তখনকার কালে দেশের মধ্যে ইংরাজি শিখিবার যে ঝোঁক দেখা দিয়াছিল—ফার্ষ্ট বুক তাহারই অক্ষর-মূর্তি, প্যারি সরকার সেই প্রবণতার গ্রন্থকার। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস যে ব্যক্তি লিখিতে বসিবে তাহাকে অনেক মোটা বইয়ের নাম বাদ দিতে হইবে কিন্তু ওই তন্বী পুস্তিকাটির নামোল্লেখ না করিয়া সে পারিবে না। ফার্ষ্ট বুক ও প্যারিচরণ সরকার একখানি বই ও ব্যক্তিমাত্র নয়—একটি প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের মন একাগ্রভাবে logical, তাঁহার ঋজু মেরুদণ্ডখানির মতোই তাঁহার মনটি ঋজু। নবদ্বীপের কোনো নৈয়ায়িকের মনও এমন logical ছিল কি না সন্দেহ। প্রবল হৃদয়াবেগ ও পরদুঃখকাতরতার জন্যই তিনি অধিকতর প্রসিদ্ধ; অধ্যাপকেরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তিনি দয়ার সাগর। সামান্য দুঃখকষ্ট দেখিবামাত্র তাঁহার অশ্রুপাতপ্রবণতা সত্ত্বেও মূলতঃ তাঁহার নাম ছিল logical. অশ্রুবিন্দুর মণিমুক্তা-খচিত খাপের মধ্যে তাঁহার logical মনখানি সরল, উজ্জ্বল, শাণিত তরবারির মত লুক্কায়িত ছিল। অধিকাংশই লোকে ওই খাপখানাই দেখিত, কেহ কেহ তরবারিখানি দেখিত, কিন্তু এই দুইয়ে মিলাইয়া কেহ দেখিয়াছিল কি? দেখিলে সে অনায়াসে বুঝিতে পারিত, বিদ্যাসাগরের জীবন প্রকাণ্ড একটা ট্রাজেডি; হৃদয়াবেগ-প্রধান জাতির মধ্যে logical মনের ট্রাজেডি; গরুর গাড়িতে চড়িয়া পদ্মা পার হইবার চেষ্টার শোচনীয় পরিণাম।

এই প্রকৃতিসিদ্ধ logical বুদ্ধির বশেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন, বিপত্নীকের যদি বিবাহ হইতে পারে, তবে বিধবার বিবাহ না হইবে কেন? তিনি স্থির করিয়াছিলেন, পুরুষ শিক্ষার সুযোগ পাইলে স্ত্রীলোক না পাইবে কেন? তাঁহার logic বলিয়াছিল, যে-কোন সামাজিক ক্রিয়া শাস্ত্রসম্মত হইলেই দেশাচার-সম্মত হইবে। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ, বহু প্রচেষ্টায় তাহাকে আইনসিদ্ধ করিলেন, তবু দেশের লোকে কেন যে তাহা গ্রহণ করিল না, এ রহস্য কিছুতেই তিনি বুঝিতে পারিতেন না। কারণ নিছক logic এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। বেচারা logic ডাকহরকরার মতো, সে চিঠিখানা পৌঁছাইয়া দিতে পারে, কিন্তু চিঠির উত্তর আদায় করাতো তাহার ক্ষমতার বাহিরে।

বিদ্যাসাগরের হাতে একখানি মাত্র logicএর তরবারি ছিল, কিন্তু তাহার বিচিত্র কার্য্য-কলাপ দেখিলে মনে হইত, তাঁহার হাতে একশত তরবারি আবর্তিত হইতেছে। একটিমাত্র তরবারি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল বলিয়াই একশত বলিয়া প্রতি-ভাত হইয়াছিল। পাকা খেলোয়াড়ের হাতে এমনিই হয়, কিন্তু তলোয়ার একখানা বই নয়। সে তলোয়ার তাঁহার logic। তলোয়ার দিয়া ছায়া-শরীরীকে বিদ্ধ করা যায় না, logic দিয়া বিদ্যাসাগর দেশাচারকে বিদীর্ণ করিতে পারেন নাই। দেশাচার সজীব সমাজের প্রেতাত্মা।

আমার বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ হৃদয়াবেগের প্রেরণায় বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে বা স্ত্রীশিক্ষা-প্রসরণে অগ্রসর হন নাই। দুইয়ের কিম্ভূত অব্যবস্থা তাঁহার অন্তর্গূঢ় নৈয়ায়িক মনকে পরিচালিত করিয়াছিল, তবে সঙ্গে আনুষঙ্গিক হৃদয়াবেগের ধাক্কা ছিল, চড়াই রেলপথে দ্বিতীয় এঞ্জিনখানার মতো। আর শুধু বিদ্যাসাগর কেন, উনবিংশ শতকের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ

বাঙালীর মন মূলতঃ logical ; তাঁহাদের সকলেরই জীবনের পরিণাম অতি logic-এর ট্রাজেডির দ্বারা রঞ্জিত। যে logic বিদ্যাসাগরকে মানবপ্রেমের পথে টানিয়া আনিয়াছিল, বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের অন্তে সেই logic তাঁহার টোল-খাওয়া জীবনকে সভ্যসমাজ হইতে দূরবর্তী কার্মাটাড়ে লইয়া গিয়াছে, যে সভ্যসমাজ সারাজীবন বিদ্যাসাগরকে নাচাইয়া ছাড়িয়াছিল, সেই বিদ্যাসাগর শেষজীবনে সাঁওতালদের হাত ধরিয়া নাচিয়া সত্যকার আনন্দ পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে আনন্দও দীর্ঘদিন পাইবার উপায় ছিল না। মাসিক সাহায্যপ্রেরণের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইত। সে ভার কি কোন বন্ধুর উপরে তিনি দিয়া যাইতে পারিতেন না ? সে পরীক্ষা বিদ্যাসাগর একবার করিয়াছিলেন। তবে ? আর কিছু নয়, বন্ধুটি টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া পরিপাক করিলেন। সেকালে সবাই জানিত বিদ্যাসাগরের টাকা অতিশয় সুপাচ্য। তিনি যে দয়ার সাগর। বাঙালী একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়, তাঁহার অনেক টাকা পরিপাক করিবার ফলে তবেই তাঁহাকে ঐ উপাধিটি দিয়াছিল।

এমন যে হইয়াছিল তার দুইটি কারণ অথবা একটি মূল কারণেরই রকমফের। উচ্চবর্ণের বাঙলীর মন logical, প্রমাণ বাঙালীর নব্য ন্যায়। তবে আবার বাঙালীর আচরণ এমন কুটিল তার কারণ কি ? সরল হইলে কুটিল হইতে বাধা নেই ; সরল সাপের গতি কুটিল ; কিম্বা সরল বলিয়াই কুটিল ; লৌহদণ্ড আর যাই হোক, কুটিল নয়। উচ্চবর্ণের বাঙালীর মনে logic-এর সরলতা, কুটিলতা দুই-ই বিদ্যমান। বিদ্যাসাগরের ছিল logic-এর সরলতা, আর যেসব বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে ঠকাইতেন, তাঁহাদের ছিল logic-এর কুটিলতা।

এ হেন বাঙালী-সমাজের উপরে, উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইংরাজিশিক্ষার ঢেউ আসিয়া পড়িল—এ কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু যে-কথা আমরা সবাই জানি না তা এই যে, সে ঢেউ নামান্তরে ফরাসী চিন্তার ঢেউ। ফরাসী চিন্তার যে আঘাতে 'ancient regime' ভাঙিয়া পড়িল, তার বীজমন্ত্র Reason, এই Reasonএর হাওয়া বিলাত ঘুরিয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিল। এদেশের প্রথম আমলের ইংরাজিশিক্ষার গুরুগণ হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসন সকলেই Reason-পন্থী, তাঁহারা ফরাসী philosopherদের মতো নাস্তিক অর্থাৎ Reasonএর আস্তিক। ইঁহাদের কৃতী ছাত্রদের অনেকেই নিরীশ্বরবাদী। বাঙালীর ইংরাজিশিক্ষার সেই সত্যযুগে ফরাসী নাস্তিক্যবাদের পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সম্যক সচেতন নই, ফলে উনবিংশ শতকের বাঙালীর মনের পূর্ণ চেহারাটা দেখিতে পাই না। একে উচ্চবর্ণের বাঙালী স্বভাবত নৈয়ায়িক, তার উপরে লাগিল Reasonএর ছোঁয়াচ, অর্থাৎ নবদ্বীপ ও প্যারিস দুইয়ের স্পর্শে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী একান্ত logical হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে ফরাসী জাতের সঙ্গে বাঙালীর প্রকৃতির খুব ঐক্য ! ফরাসী জাতের ভাবালুতা বাহ্য, ভিতরটা তাদের লাটিন প্রকৃতি-সুলভ logical। ইংরাজজাত আচারে-ব্যবহারে যতই সংযত হোক, অমন ভাবালু জাত আর নাই ; মৃত্যুকালে তাহাদের জাতিধর্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে ; নেলসনের 'Kiss me Hardy' এবং স্যার ফিলিপ সিডনি-র 'Thy necessity is greater than mine,' চরম দৃষ্টান্ত ; মৃত্যুকালে

নাস্তিকের মুখে ভগবৎ নামোচ্চারণের মতো। বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না সত্য; ইংরাজি ভাষাও পরিণত বয়সে শিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সারা বাঙলাদেশে তখন যে-হাওয়া বহিতেছিল তিনি তার অতীত ছিলেন না, তার উপরে ছিল তাঁর উচ্চবর্ণের বাঙালীর নৈয়ায়িক মন।

ভাবালুতায় ঐক্য, বুদ্ধির প্রখরতায় ভেদ; logicএর পরিণাম প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি আস্থা তৎকালীন বাঙালীসমাজের আর একটা লক্ষণ। তৎকালীন প্রত্যেক বিশিষ্ট বাঙালী আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের ফলে সমাজ-ছাড়া জীব; বিদ্যাসাগর যে-ভাবে সমাজছাড়া আর যে-ভাবে সমাজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন তেমন কোন ব্রাহ্মও নয়, তেমন কোন দেশীয় খৃষ্টানও নয়। বিদ্যাসাগর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চরমপন্থী; এমন লোকে যে চাকুরি ছাড়িবেন মোটেই বিস্ময়কর নয়, আদৌ তিনি যে চাকুরিতে ঢুকিয়াছিলেন সেটাই অধিকতর বিস্ময়ের। এই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার ফলেই সেকালের বাঙালীসমাজে ব্যক্তিত্বের বিচিত্র type দেখা যাইত; একালে সব যেন কেমন একাকার; ইহা কি সমাজনিষ্ঠার ফল না বাঙালীর logical মনের উপর বহিরাগত ভাবালুতার পোঁচ পড়িতে শুরু করিয়াছে; কিম্বা সমাজের নিম্নবর্ণের ভাবালু মন উচ্চ-বর্ণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত? কারণ যাই হোক, এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার মতো একটা লক্ষণ বটে।

বিদ্যাসাগর বাঙলাদেশে প্রথম Peoples' man বা জনাধিনায়ক; বাঙলার কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্বত্র তাঁহার সমান আদর ও গতি। তাঁহার আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় এমন কিছু ছিল যাহা সত্যই সার্বভৌম। লাটসাহেব ও চৌকিদারের মধ্যে তিনি প্রভেদ করিতেন না। সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করাতেই প্রকৃত আভিজাত্য। গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে প্রকৃত অভিজাত বিদ্যাসাগরের জন্ম। তখনকার অনেকেই জানিত না বিদ্যাসাগর তাঁহার নাম, না উপাধি। বিদ্যাসাগরবাবু বলিয়া তাঁহার উল্লেখের দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্তীকালের সুভাষচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে জীবিতকালে এমন সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি বাঙলায় আর দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

সাধারণ পাঠ্যপুস্তকাদিতে তাঁহার যে চিত্র প্রচলিত তাহা বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি মাত্র, তাঁহার প্রকৃতি তাহাতে ধরা পড়ে নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রচারিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর পুরোভাগে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের একখানি ছবি আছে। সেই ছবিখানিতে বিদ্যা-সাগরকে কতকটা পাওয়া যায়। কিন্তু যৌবনের উৎসাহপ্রদীপ্ত সে বিদ্যাসাগর মূর্তি নয়! শক্তিমান মুখমণ্ডল বয়োভারপীড়িত, নৈরাশ্যে চাপা-পড়া প্রতিভার সূর্য্যকিরণে ওষ্ঠাধর ও চোখ দুইটি এখনো ম্লানোজ্জ্বল, বহুক্ষত দুর্গ-প্রাকার এখনো অটল। পরণের চাদর ও পিরাণ ভাঁজে ভাঁজে রোমান সিনেটরদের টোগাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রোমান সিনেটরই বটে, তবে রোমান রিপাবলিকের শেষ দশার সিনেটর, বর্বরগণ যখন সিংহদ্বারে করাঘাত করিতেছিল। উনবিংশ

শতকের বুদ্ধির আভিজাত্যের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই যেন নূতন শতাব্দীর সব-ভাঙাদের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন।

গোলদীঘিতে তাঁহার যে মূর্তিটি আছে তাহা বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ। কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসীর কৃতঘ্ন দান। ওই পাথরের পিণ্ডটি যত শীঘ্র অপসারিত হয়, ততই মঙ্গল। জীবিতকালে বাঙালী তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহার জের টানিয়া লইবার কোন আবশ্যক ছিল না।

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন কবিপ্রতিভা, আকস্মিকতা ও Sonbberyর সমন্বয়ে গঠিত। মাইকেলের কবিপ্রতিভার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থাবলী। কিন্তু আকস্মিকতা ও স্নবারি সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন নই। আকস্মিকতার ধাক্কাতেই তিনি বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিতে বাধ্য হন। অকস্মাৎ পিতার মৃত্যুসংবাদ, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আশা তাঁহাকে যে শুধু মাদ্রাজ হইতে বাঙলা দেশে টানিয়া আনিল তাহাই নয়, বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিল। তাঁহার পিতা আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে মাইকেল বাকী জীবনটা হয়তো বিদেশে অপাঠ্য ইংরেজি কবিতা লিখিয়া কাটাইয়া দিতে বাধ্য হইতেন, বেথুনের চিঠিও প্রত্যাশিত ফলপ্রসব করিত কি না সন্দেহ। তারপরে রত্নাবলীর রিহার্সাল দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাঙলা নাটক লিখিবার ইচ্ছা এবং বাঙলা নাটক লিখিতে গিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চ্যালেঞ্জে অমিত্রচ্ছন্দ লিখিবার ইচ্ছা—দুইই আকস্মিক, সঙ্গে কিছু পরিমাণে স্নবারিও মিশ্রিত ছিল। জন্ম-স্নব না হইলে ওরূপভাবে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ বা চ্যালেঞ্জ-গ্রহণ করে না। মাইকেল অতর্কিতে হোঁচট খাইয়া অমিত্রাক্ষর আবিষ্কার করিলেন।

তাঁহার স্নবারির তালিকা আরও দীর্ঘ। বিলাত যাইবার ইচ্ছা এবং তদনুষঙ্গ হিসাবে খৃষ্টধর্মগ্রহণ, স্বরচিত কবিতা Poet-Laureate ওয়াডস্বার্থের নামে উৎসর্গ, 'রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র গণিয়া টাকা খরচ করে না ;' 'নূতন পোষাক পরিয়া 'আমাকে কি বর্দ্ধমানের মহারাজার মত দেখায় না' ; 'আর কবি মধুসূদন নয়, মাইকেল এম. এস. ডাট ব্যারিস্টার-এট-ল অব গ্রেজ ইন,' সবই বিশুদ্ধ স্নবারি। অসুস্থ অবস্থাতে তিনি কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কেননা সাহেবরা ওই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায় না। মাইকেল 'কৃষ্ণকুমারীর' ইংরেজি বানান লিখিতেন 'কিষেণ কুমারী'। সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত অনেকেই স্নবারির নূতনতর পন্থা না পাইয়া নিজের নামটার বিকৃত উচ্চারণ লিখিতেন। সেকালের নূতন ইংরেজি-শিক্ষিতের মধ্যে ব্যাপক স্নবারি ছিল। ওইখানে তৎকালীনদের সঙ্গে মাইকেলের মিল। কিন্তু আর সকলের স্নবারি যখন বিরক্তিকর মাইকেলের স্নবারি অনুরক্তিকর। বালকের স্নবারিব মতো মধুর স্নবারি মনে স্নেহের উদ্রেক করে। মাইকেল চিরকালীন বালক, তাঁহার বয়স বাড়িয়াছিল, বুদ্ধি বাড়ে নাই। এমন বালকোচিত সরল প্রতিভাবান পুরুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

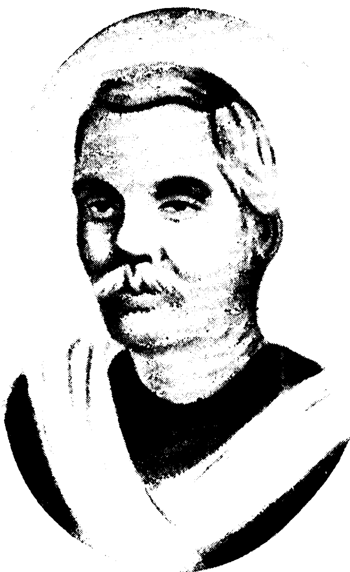
বাঙলার মৃত মহাসাহিত্যিকদের একজনের সহিত দেখা করিবার অভাবিত সুযোগ মিলিলে আমি মধুসূদনের সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' বাছিয়া লই। বঙ্কিমচন্দ্র অপরিচিতের কাছে বড় বেশি রাশভারি। সৌভাগ্যক্রমে মেজাজ ভাল থাকিলে ধান-চাল সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও করিতে পারেন, (যেমন দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে করিয়াছিলেন)। আর তাহা না থাকিলে 'হুঁ,' 'না'



বঙ্কিমচন্দ্র



মাইকেল মধুসূদন



টেকচাঁদ ঠাকুর



কালীপ্রসন্ন সিংহ

বলিয়াই বিদায় দিবেন, তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্যকে নাড়িবার শক্তি আমার হইবে না। অপরিচিতের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুর্লভ না হইলেও তাঁহার বাণীর ফল্গুধারাকে টানিয়া বাহির করা সহজ নয়। দু'চার কথা বলিয়া হয়তো পার্শ্ববর্তী সুধাকান্তকে বলিবেন—'ওঁকে জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দে' —এই বলিয়া সুকৌশলে বিদায় দিবেন। কিন্তু মাইকেলের অবারিত দ্বার ও অবারিততর মন। তিনি নূতন সনেটটা পড়িয়া শুনাইবেন, আমি প্রশংসা করিলে (ভালো না লাগিবার আশঙ্কা নাই) মিসেস ডাটকে ডাকিয়া শুনাইবেন, 'কিষেণ কুমারীর' একটা দৃশ্য হয়তো অভিনয় করিয়া আবৃত্তি করিবেন, আমার ভালো লাগিলে খুশী হইয়া হাততালি দিয়া উঠিবেন, তারপরে উঠিবার উপক্রম করিলে বলিবেন—

'Don't go away man, boy, give him a peg' !

আর বিদায় লইবার সময়ে দরজার প্রান্তে আসিয়া নির্বিকারভাবে বলিবেন, 'তোমার পকেটে কিছু আছে ?' আমি সানন্দে রাহাখরচটা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিব। দীর্ঘপথ হাঁটিয়া ফিরিবার উদ্যোগ সত্ত্বেও এমন লোককে কেহ ভাল না বাসিয়া পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট শত্রু ছিল, মাইকেল অজাতশত্রু ছিলেন বলিলেও হয়। এমন সরলচিত্ত বালক ও অনাবিল স্নবকে কেহ ভাল না বাসিয়া পারে ! স্নবারি তাঁহার ধাতুগত। এই উপাদানটুকু বাদ দিয়া বিচার করিলে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইবে। তাঁহার প্রতিভার আত্মম্ভরিতার মধ্যে ওই খাদটুকু না থাকিলে তাঁহাকে কেহ সহ্য করিত না। যে স্নবারি তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছিল, সেই স্নবারিই পরোক্ষে তাঁহাকে উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করিতে প্রদ্যোত করিয়াছিল। মাইকেল ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভারতীয় কলম্বাস।

সুদূর ইউরোপীয় সংস্কৃতি-মহাদেশের সংবাদ মাইকেলের অনেক আগেই এদেশের লোকে জনশ্রুতিযোগে জানিতে পারিয়াছিল। রামমোহন জানিতেন। ডিরোজিও, রিচার্ডসন, হেয়ার, মেকলে, বেথুন—সে মহাদেশের সন্দেশ বিতরণে উদ্যত ছিলেন। ডিরোজিও, রিচার্ডসনের হিন্দুত্ব-বিদ্বিষ্ট প্রতিভাবান্ ছাত্রগণ সেই মহাদেশের সঙ্গে এদেশের যোগসাধনে সচেষ্ট ছিলেন, আবার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেই দূরবর্তী সংস্কৃতি-রাজ্যের হাওয়া এদেশে আসুক চাহিতেন। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট আধুনিক গদ্য সেই দেশের পরোক্ষ প্রভাব এদেশে আনিতে সমর্থ হইলেও আসল কাজটা অপরের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। অনাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের কথা কলম্বাস-পূর্ববর্তী ইউরোপ কি কানাঘুষায় শোনে নাই ? কথিত আছে যে, ভাইকিং নাবিকজাতি বহুপূর্বে আমেরিকায় গিয়া পৌছিয়াছিল। কিন্তু কলম্বাসের সামুদ্রিক প্রযত্নেই দুই মহাদেশ, নবীন ও প্রবীণ পরস্পরসম্বদ্ধ হইল। ইউরোপীয় জীবনের প্রভাব ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্থায়ী করিবার কাজে মধুসূদনের স্থান কলম্বাসের অনুরূপ। তাঁহার পূর্বে যে-প্রভাব বিদেশী সাহিত্যের ও অনভ্যস্ত টেকনিকের উত্তমাশা অন্তরীপের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ক্ষীণভাবে মাত্র আসিয়া পৌছিত, ল্যাম্বভার্সের সুয়েজ খাল কাটিয়া তাহার পথ

তিনি প্রশস্ত ও অনেকখানি হ্রস্বতর করিয়া দিলেন। তৎকালীন অনেকে মনে করিত খাল কাটিয়া তিনি কুমীর আনিলেন।

সুয়েজ খাল প্রস্তুত হইবার আগে ইউরোপ ও ভারতবর্ষ পরস্পর জানিত হইয়াও দূরবর্তী ছিল এবং সুয়েজ খাল কাটা না হইলে আজিও তাহারা দূর-আত্মীয়ের মতই থাকিয়া যাইত। সুয়েজ খাল খনিত না হইলে এই দুই দেশের মধ্যে মালের আদানপ্রদান চলিত, মনের চলিত কি না সন্দেহ। একশত মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খাল পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী সাত হাজার মাইল পথকে ছাঁটিয়া দিয়াছে। সুয়েজ খাল উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ ভাব-ভূগোলের সুয়েজ খাল। এই ছন্দপথেই ইউরোপীয় ভাব-জীবনের প্রচণ্ড প্রবাহ ভারতবর্ষের চিত্তে আসিয়া আঘাত করিল। ইতিপূর্বে তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের খণ্ড গদ্যের এবং পরবর্তীকালের বিদ্যাসাগরের সরল গদ্যের সঙ্কীর্ণ খাতে মন্দভাবে আসিত। কিন্তু ইউরোপের প্রাণ-প্রবাহের আবেগকে বহন করিবার ক্ষমতা কি ওই গদ্যের! সেই দূরন্ত অশ্বারোহীর জন্য উচ্চৈঃশ্রবার আবশ্যক। পয়ারের গরুর গাড়ি কিম্বা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ঐরাবতে সে পদে পদে বাধা পাইয়া দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এমন সময়ে মাইকেলী অমিত্রচ্ছন্দের স্বচ্ছন্দযতির অনায়াসগতিতে পয়ার ত্রিপদীর বেড়া ভাঙিয়া-চুরিয়া ইউরোপীয় সংস্কৃতি ভারতের চিত্তক্ষেত্রে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া পড়িল—আজিও তাহার ক্রিয়া সজীব। মাইকেল ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে তাহার যোগ্য বাহনটি দিলেন।

গদ্য চিন্তার ভাষা। বিদ্যাসাগর চিন্তার ভাষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধির যোগ বন্ধুত্বের যোগ নয়। ইউরোপ তখনও সদাগরী অফিসে ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আবদ্ধ ছিল। পদ্য অনুভূতির ভাষা। মাইকেল হৃদয়ের পথ খুলিয়া দিলেন। গদ্য যাহাকে ঘাট পর্য্যন্ত আনিয়াছিল, পদ্য তাহাকে ঘর পর্য্যন্ত ডাকিয়া আনিল। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের পূর্বে ইউরোপ ছিল "না ঘাটকা ন ঘরকা।" একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং একজন খৃষ্টান-পণ্ডিত দুই আধা নাস্তিকে মিলিয়া ইউরোপীয় স্বর্গকে টানিয়া ভূতলে নামাইল! বিধাতা কাহাকে দিয়া যে কোন্ কাজ করাইয়া লন—আশ্চর্য্য!

এক দেশের প্রভাব অপর দেশে যখন সাহিত্যের পথে প্রবেশ করে, তখনই প্রাণের ক্রিয়া করে। নতুবা হাজার বৎসর মাল আমদানি-রপ্তানী করিলেও সুফল দেয় না। ইউরোপের সঙ্গে এদেশের ব্যবসার যোগ বহুকালের, আফ্রিকার দেশীয় সামন্ত রাজ্যসমূহেও ইউরোপীয় মাল অল্প যায় না, অল্প কাল যায় না। কিন্তু মাইকেলের আগে এখানে কেহ ব্ল্যাঙ্কভার্স লিখিবার কল্পনাও করে নাই। মাইকেল এই কাজটি করিয়া ইউরোপের চিত্তের পরিচয় দিলেন এবং সে পরিচয় চিরন্তন হইল। তখনকার ভারতবর্ষে বাঙলাদেশ ইউরোপীয়দের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল, ইংরাজি-শিক্ষার প্রাথমিক স্বর্গ ছিল, আর মাইকেল নামে কবির জন্মভূমি ছিল। তাই ইউ-রোপীয় প্রবাহ বাঙলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রথমে প্রবেশ করিল। কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। বাঙলাদেশ ও ইংরাজশাসনকে কেন্দ্র করিয়া মাইকেলের আবিষ্কারের প্রভাবও

ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। মাইকেল নূতন পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা মাত্র নহেন, নূতন ভারতবর্ষের স্রষ্টাদের অন্যতম। রামমোহনের সহিত মধুসূদনের নাম একসূত্রে গ্রথিত হইবার যোগ্য।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাইকেল স্নব ছিলেন। "ইহা কি আমাকে অমর করিবে না রাজনারায়ণ ?" তাঁহার কবিখ্যাতি অমর হইয়াছে সত্য, সেই-সঙ্গে তাঁহার স্নব-খ্যাতিও অমরতা অর্জন করিয়াছে। যে-ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যুকালে নির্ভুল শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতে পারে, তাহার স্নবারি আর যাই হোক কৃত্রিম নয়। গুণ কৃত্রিম হইলে ত্যাজ্য; অকৃত্রিম দোষ হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই অকৃত্রিমতাই মধুকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছিল।

মাইকেলের অনেকগুলি ছবি আছে, তখন ফটোগ্রাফির রেওয়াজ আধুনিক কালের মতো হইলে আরো অনেক ছবি থাকিত। ফটোগ্রাফের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই; খুব সম্ভব এইরকম একটা আক্ষেপ মধুর মনে ছিল। মাইকেলের স্থূলায়ত, ঈষন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের সঙ্গে ইংরেজ কবি কোলরিজের ওষ্ঠাধরের মিল আছে, দুজনেই কি সমান অব্যবস্থিতচিত্ত নয়? আর অপ্রত্যাশিত মাদকদ্রব্যের আশায় দুজনেরই ওষ্ঠাধর সর্বদা যেন ঈষন্মুক্ত! মাইকেলের গড়ানে কপালে সঙ্কল্পের শিশিরবিন্দু মুহূর্তমাত্র টলমল করিয়াই গড়াইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু প্রতিভার নির্বিকার দ্যুতি তাঁহার শান্তোদার, লক্ষ্যসন্ধানী অচঞ্চল চক্ষুতে। ওই দুটি নেত্র সমুদ্র-পারবর্তিনী কমলে কামিনীর সন্ধান জানে। মাইকেল ঠিকে ভুল করেন নাই। তাঁহার বীজ-মন্ত্র ছিল "শরীরের পাতন বা মন্ত্রের সাধন।" কেহ একটা করে, কেহ অপরটা। তিনি যুগপৎ দুয়েরই চরম করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। এমন সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধি কয়জনের ভাগ্যে জোটে?

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে দেখিতে পাই সন্ন্যাসী অভিরাম স্বামীকে। তারপর প্রায় প্রত্যেকখানা উপন্যাসে একজন করিয়া অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাবিশিষ্ট সন্ন্যাসী বর্তমান। কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো আধুনিক জীবনের কাহিনীতে সন্ন্যাসীর স্থান সঙ্কীর্ণ—প্রত্যক্ষতঃ সন্ন্যাসী নাই, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসীতে পরিণত করিয়া সে অভাব যেন পূরণ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীদের পূর্ব-ইতিহাস অপরিজ্ঞাত এবং উত্তর-ইতিহাসও সুস্পষ্ট নয়, মাঝখানে তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা কাহিনীর স্রোতকে অভীপ্সিত দিকে চালিত করিতেছেন, শিল্পের দায়িত্ব অলৌকিক শক্তির নিকটে পরাজিত হইয়াছে। এই ব্যাপার অনেকটা গ্রীক নাটকের 'God-Machine'-এর অনুরূপ। গ্রীক দর্শকগণ যেমন বিনা তর্কে দেবতাদের লীলাখেলা মানিয়া লইত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠকেরও তেমনিভাবে সন্ন্যাসীদের মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই ব্যাপারটিকেই আমরা সন্ন্যাসরোগ বলিতেছি। অনেকে মনে করেন স্কটের উপন্যাসের মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীচিত্র হইতে এই রোগটি বঙ্কিমচন্দ্রে সংক্রামিত হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্রানুসরণের জন্য ততদূর যাইবার আবশ্যক আছে কি? ভারতবর্ষ সন্ন্যাসীর দেশ—এখানে সন্ন্যাসী অপ্রতুল নয়। চোখের সম্মুখের সন্ন্যাসীকে বাদ দিয়া স্কটের কাল্পনিক সন্ন্যাসীকে পূর্বসূত্র মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্রের ও তাঁহার পিতার জীবনের সহিত একাধিক সন্ন্যাসীর অলৌকিক কাহিনী জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিক-দর্শনের ঘটনাও সর্বজনবিদিত। শেক্সপীয়র যে-ভাবে ভূত, প্রেত ও ডাকিনীতে বিশ্বাস করিতেন বঙ্কিমচন্দ্রও যে সেইভাবে সন্ন্যাসীদের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন—ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। ভারতীয় জীবনের অন্যতম উপাদানরূপে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসজাত অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাকে তিনি উপন্যাসে ব্যবহার করিয়াছেন। কাহিনীর শিল্পধর্মের সহিত সর্বত্র তাহা খাপ খাইয়াছে কিনা—এ প্রশ্ন অতিশয় প্রাসঙ্গিক—কিন্তু এ প্রশ্ন তো উপন্যাসের লৌকিক চরিত্রগুলির সম্বন্ধেও উঠিতে পারে, উঠিয়াছে, গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীকে হত্যা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু তাই বলিয়া রোহিণী বা গোবিন্দলালের সৃষ্টিতে কেহ তো আপত্তি করে নাই। কাজেই তাঁহার সন্ন্যাস রোগটিকে একটু তলাইয়া বোঝা আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্রের একখানামাত্র উপন্যাসে একজন সন্ন্যাসী থাকিলে বিষয়টিকে গৌণ মনে করিতে পারিতাম। কিম্বা আনন্দমঠের মতো একখানা সন্ন্যাসীপ্রধান উপন্যাসকেও কাহিনীর দাবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, কিন্তু একজন লেখকের সমস্ত উপন্যাসে একটি বা একাধিক সন্ন্যাসী যদি মুখ্য পাত্ররূপে দেখা দিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে ইহা লেখকের ব্যক্তিত্বের

ও বিশ্বাসের একটা 'সামান্য' বা সাধারণ লক্ষণ—ইহাকে আর উপেক্ষা করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সদা-উপস্থিত সন্ন্যাসী কিসের লক্ষণ? লেখকের কোন্ পরিচয় ইহাতে নিহিত? রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ঠাকুরদাদা এইরকম একটি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত চরিত্র।

ভারতীয় জীবন বলিতে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কুহেলিকাতে ধূসর, বহু শত যুগের উত্থানপতনের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের গৈরিকে মণ্ডিত এবং সুগভীর অধ্যাত্ম রাত্রির তপস্তপ্ত নক্ষত্রভাতির দ্বারা রহস্যময় একটা বস্তুকে বুঝি। সে বস্তু এতই ছায়াবৎ, যেন কোন পার্থিব পদার্থ নয়, পার্থিব পদার্থের একটা প্রতীক মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীদৃষ্টি স্বভাবতই এই বস্তুটির প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। প্রথম দিকে তিনি দূরকালের কাহিনী অবলম্বনে গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন, সেই দূর দিগন্তের ঝাপসা পরিপ্রেক্ষিতে অমিতশক্তি সন্ন্যাসীকে ব্যবহারের যথেষ্ট অবসর ছিল। প্রথম প্রথম তিনি কাহিনীর দাবীতে, অচেতনভাবে সন্ন্যাসীর অবতারণা করিতেন, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত এই সন্ন্যাসী তাঁহার কাছে ভারতীয় জীবনের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই বঙ্কিমের সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য। দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার কালে ভারতীয় জীবনসম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যতই তাঁহার বুদ্ধি পরিণত ও জ্ঞান বিস্তৃত হইতে লাগিল, ভারতীয় জীবন যতই তাঁহার কাছে স্পষ্টতর ও মূল্যবত্তর হইয়া উঠিতে লাগিল—ততই তাঁহার সৃষ্ট সন্ন্যাসি-চরিত্রেও একটা বিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিল এবং অবশেষে কখনো শিল্পের দাবী স্বীকার করিয়া, কখনো সে দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার সন্ন্যাসী ভারতীয় জীবনের, বঙ্কিম যে-ভাবে ভারতীয় জীবনকে বুঝিতেন, সেই জীবনের প্রতীক হইয়া উঠিল। দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী ও দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠকে—মৃণালিনীর মাধবাচার্য্যে ও আনন্দমঠের সত্যানন্দে বিবর্তনজাত এই প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রভেদ কি কেবল মাত্রাগত? মাত্রার এত আধিক্য ঘটিয়াছে যে, প্রভেদটা প্রায় গুণগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ভারতীয় জীবন বলিতে সংসারবর্জিত একটা নির্গুণশূন্যতা মাত্র বোঝায় না—এ সত্য বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, সেইজন্যই দেখিতে পাই, এই প্রতীকী সন্ন্যাসীরা কেহই সংসারের দাবীর প্রতি উদাসীন, দায়িত্বহীন ভবঘুরের দল নহে। অভিরাম স্বামী, মাধবাচার্য্য, ভবানী পাঠক, আনন্দমঠের সন্ন্যাসীসম্প্রদায় দেশ ও দশের দাবীর প্রতি একান্ত সজাগ—এমন কি, সংসারীদের চেয়েও অধিকতর সজাগ। তাঁহারা নিরাসক্তভাবে কাজ করিয়া যান, তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী। এইবারে গীতা আসিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের বিবর্তনে দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া পড়িলেন। রহস্যচ্ছলে সন্ন্যাসী সাজিতে গিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস রোগে ধরিল, গল্পের খাতিরে সন্ন্যাসী আমদানী করিয়া তাহার মধ্যে মহত্তর সম্ভাবনা আবিষ্কারের ফলে তিনি তাহার করায়ত্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীরা বড় ভয়ানক জীব! বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, এই সন্ন্যাসীদের মুখপাত্র করিয়া নিষ্কামকর্ম প্রচার করিবার অতি উদার ক্ষেত্র—এবং আবশ্যক অতিশয় জরুরী ছিল তখন।

তখন সময়টাই অত্যন্ত জরুরী ছিল, সব কাজই তাড়াহুড়া করিয়া করিতে হইয়াছিল। তখন কেবল দেশী গাঙে পশ্চিমের প্রবল বান আসিয়া ঢুকিয়াছে, নৌকার মাঝিরা সামাল সামাল রব তুলিয়াছে, কত নৌকা বেসামাল হইয়া ডুবিল, কত নৌকা সামলাইতে না পারিয়া কূল ছাড়িল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বান তীর ছাপাইয়া গ্রাম ভাসায় আর কি! রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার সহিত দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা জুড়িয়া দিলেন, তিনি ব্রাহ্মধর্মের খাড়ি খনন করিয়া দিয়া শান্ত জলে অনেক নৌকাকে আশ্রয় দিলেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বিদেশী পাদ্রি ও কালা পাদ্রিদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা হইল; মিশনারী স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের যাহাতে আর যাইতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতা সমাজের সর্বদলের হিন্দুপ্রধানগণ মিলিত হইয়া রাতারাতি চাঁদা তুলিয়া হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন; ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সঙ্কলন করিলেন, কথিত আছে যে, শেষোক্ত কাজটি অক্ষয় দত্তের সাহায্যে তিনি মাত্র তিন ঘণ্টায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালীন সব কাজের মধ্যেই একটা তাড়াহুড়ার লক্ষণ ছিল, এবং তার ফলে জোড়াতাড়ার ভাব রহিয়া গিয়াছে। গৃহগ্রাসী বন্যার মুখে বাঁধ বাঁধিবার বেলায় কি রাত্রিদিন বিচারের সময় আছে? হাতের কাছে যাহা জুটিয়াছে তাহাতেই কাজ চালাইতে হইয়াছে। এইভাবে কাজ-চালানো গোছের একটা সমাধান হইল বটে!

বঙ্কিমের সময়ে অর্থাৎ ১৮৬০-এর পরে ইংরাজি পড়িয়া খৃষ্টান হইবার নেশা কাটিয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু বঙ্কিম বুঝিতে পারিলেন, আর একটা বন্যা আসন্ন। এবারে আর পাদ্রিদের আক্রমণ নয়, পেট্রিয়টদের আক্রমণ। বঙ্কিম বিলাতি পেট্রিয়টিজ্‌মকে বড়ই ডরাইতেন। বিলাতি দেশপ্রেম স্বদেশের যতই স্বার্থসম্মত হোক অপর দেশের পক্ষে এমন অভিশাপ আর নাই। ক্লাইভের কীর্তি এদেশে এবং ওদেশে বিপরীত-প্রভাবী। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, বিলাতি দেশপ্রেমের নেশা আমাদের পাইয়া বসিলে সমূহ বিপদ! অথচ বিলাতি দেশপ্রেমে শিখিবার বস্তুর অভাব নাই। দেশপ্রেম হইতে পরদেশ-বিদ্বেষ বাদ দিতে পারিলে পরম কল্যাণকর রসায়ন হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই বিদ্বেষ-বিষটুকু বাদ দিবার উপায় কি? এমন সময়ে তাঁহার নজর গীতার নিষ্কামকর্মের প্রতি পড়িল। উপদিষ্ট অর্জুন নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন—আমরা কি নিষ্কামভাবে দেশহিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি না? অর্থাৎ বিলাতি পেট্রিয়টিজমের মধ্যে গীতার রস মিশাইয়া লইলে কাজ চলিতে পারে কিনা—ইহাই ছিল তাঁহার সমস্যা। এমন মিশ্রণ সম্ভব কিনা, তাহাতে ফল পাওয়া যাইবে কিনা, স্থিরভাবে ভাবিবার অবসর তাঁহার ছিল না, সেকালে কাহারো ছিল না। এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পী বঙ্কিম দার্শনিক বঙ্কিম হইয়া উঠিলেন। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম লিখিলেন। অনেকে এ তিনখানিকে বঙ্কিমের অপকৃষ্ট রচনা মনে করেন। আশ্চর্য্যের নয়। এই বিচিত্র সমস্যা সমাধানকল্পে লিখিত

হইয়াও যে প্রথম দুইখানা (সীতারামকে কোনক্রমেই অপকৃষ্ট রচনা বলা যায় না) এমন চিত্তাকর্ষক (চিন্তাকর্ষক তো বটেই !) হইয়াছে ইহাই পরম বিস্ময়ের !

১৮৮২ হইতে ১৮৮৮—এই ছয় বৎসরকাল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের চরম সন্ধিস্থল। গীতার নিষ্কামধর্ম ও বিলাতি দেশপ্রেমের বিষম গ্রন্থিতে যেমন সুষ্ঠুভাবে মিল খায় নাই, জোড়াতাড়ার চিহ্ন বিদ্যমান, তেমনি একটা উদ্ঘাতিনী গ্রন্থি তাঁহার জীবনের এই পর্বটাতে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ও গীতার ভাষ্য লিখিত। তাঁহার এই সময়কার অন্তর্জীবনের ইতিহাস যদি লিখিত হইত! শিল্পীতে ও দার্শনিকে, চিরকালের কাহিনী-স্রষ্টায় ও তৎকালের সমস্যাপীড়িতে, কি অন্তহীন সংগ্রামই না চলিয়াছে তাহা কে বলিবে? যিনি বলিতে পারিতেন তিনি স্বয়ং সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া গিয়াছেন। শিল্প শিল্পীর হৃদয়ে নিঃসপত্ন অধিকার চায়; উপেক্ষিত শিল্প অত্যুচ্চ শিল্পীকেও মার্জনা করে না। দেবী চৌধুরাণীর অনেক স্থলের ভাষা তাঁহার দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যমনস্ক কলমের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শিল্পী ও দার্শনিকের মধ্যে লেখক বিভক্ত বলিয়াই প্রতিভার অখণ্ড রস ভাষায় সর্বত্র নাই! কিন্তু ওইটুকুতে তাঁহার আত্মদ্বন্দ্বের আর কতটুকু পরিচয়! আসল ইতিহাস তাঁহার চাপা ওষ্ঠাধর চাপিয়া রাখিয়াছে—এখন আর জানিবার উপায় নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিল্পীরই জয় হইয়াছে—প্রমাণ, পরিণত ইন্দিরা ও পরিণত রাজসিংহ। সংশয়ের উপত্যকা অতিক্রম করিয়া শিল্পের সমুন্নত শিখরে তিনি পুনরায় উন্নীত হইয়াছেন। রাজসিংহ শুধু তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মাত্র নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি ছবি সমধিক প্রসিদ্ধ। পরিণত বয়সের বঙ্কিমচন্দ্র, শালের পাগড়ি মাথায়, দাড়িগোঁফ কামানো, মুখে চোখে শাণিত ইস্পাতের উজ্জ্বলতা—এখানাতে পাই তীক্ষ্ণধী দার্শনিককে। আর একখানা ছবি তাঁহার যৌবনের। বামহাত টেবিলে রাখিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট, কুঞ্চিত দ্বিধাবিভক্ত কেশদাম, মুখে চোখে একটা তন্দ্রাঘন মোহের ভাব। সমস্ত মিলিয়া একটা জ্যোৎস্না রাত্রির ভাব, মনে আনিয়া দেয় আগের ছবিখানাতে যেমন দেয়—দীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর স্পষ্টতা! এই ছবিখানা শিল্পী বঙ্কিমের, কবি বঙ্কিমের! এই ছবি দু'খানাতে তাঁহার জীবনের দুই কোটির চিহ্ন। কিন্তু যেখানে এই দুই কোটি কয়েক বৎসরের জন্য মিলিত হইয়াছিল, অন্তহীন সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন কোথাও নাই! আহা যদি থাকিত!

টেকচাঁদ ঠাকুর

মধুস্থদন মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে কিছুকাল প্যারিচাঁদ মিত্রের ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। এখানে প্রায়ই প্যারিচাঁদ মিত্র বেড়াইতে আসিতেন এবং মাইকেলের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা করিতেন। তখন 'আলালের ঘরের দুলাল' সবে বাহির হইয়াছে। একদিন মাইকেল প্যারিচাঁদকে বলিলেন— 'এ আবার কি করিতেছেন? আপনি কি ঘরে বাইরে আটপৌরে ভাষা চালাইবেন নাকি?'

প্যারিচাঁদ স্বীকার করিলেন যে, সংস্কৃতবহুল ভাষার বিরুদ্ধে, আটপৌরে ভাষাকেই সর্বকার্য্যে নিয়োগ তাঁহার অভীষ্ট।

মাইকেল বলিলেন যে, 'আপনার আলালী ভাষা চলিবে না।'

তারপরে বলিলেন—'আমি যে-ভাষা চালাইব—তাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইবে।'

সেদিনের মতো আলোচনাটা এখানেই শেষ হইয়া গেল। তবু একেবারে শেষ হয় নাই। প্যারিচাঁদ ও মাইকেল এই দুজনের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কাহারটি সফল হইয়াছে—এই প্রশ্ন আজ সকলের সম্মুখে উত্তরের আশায় রহিয়াছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রতিবাদে আলালী ভাষার উদ্ভব। একদিকে সংস্কৃতবহুল বিদ্যাসাগরী ভাষা—অপরদিকে দেশী শব্দ ও ফার্সিশব্দবহুল আলালী ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, সর্বজনের বোধগম্যতা গুণ থাকার জন্যই 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইবামাত্র সর্বজনের মনোহরণ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

সেকালের সংস্কৃতবহুল ভাষার দুরূহত্বসম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—"অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা', জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতায় যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম 'জিগীষা' জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিট্‌চীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।"

অক্ষয় দত্তর ভাষার পক্ষে ওকালতি করিবার ইচ্ছা আমার নাই। বিদ্যাসাগরী ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিব। কারণ বিদ্যাসাগরী ভাষাই সংস্কৃতবহুল ভাষার আদর্শ বা মূল ছাঁদ, আরও কারণ এই যে, বরাবর সকলকেই বিদ্যাসাগরী ভাষাকেই আলালী ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইয়াছে। তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, একদিকে বিদ্যাসাগরী ভাষা, অপরদিকে আলালী ভাষা—আর এই দুইয়ের টানাটানির সমন্বয় বঙ্কিমী ভাষা। পূর্বতন যুগের বঙ্কিমী সমন্বয় আবার পরবর্তী যুগের একতর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে তর্কের স্থান এখানে নহে।

এখন প্যারিচাঁদের সাহিত্যিক শক্তি ও ভাষায় নূতন দিগদর্শন দানের প্রতিভা অস্বীকার না করিয়াও একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে। সেকালের সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, আর একালেরও অনেকে বলিতেছেন যে, আলালী ভাষা সর্বজনবোধ্য ছিল। হয়তো ছিল—নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ তেমন সাক্ষ্য দিবেন কেন? কিন্তু আসল প্রশ্নটা হইতেছে—আলালী ভাষা এখনো সর্বজনবোধ্য আছে কি না? কিম্বা প্রশ্নটাকে আরও বিশদভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে—আলালী ভাষা ও বিদ্যাসাগরী ভাষার মধ্যে কোন্ ছাঁদের ভাষা বর্তমানে সর্বজনবোধ্য? সর্বজনবোধ্য বলিয়া কোন ভাষা নাই, তাই বলা উচিত কোন্ ভাষাকে এখন অধিকসংখ্যক লোকে বুঝিতে সমর্থ? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার সহজতম উপায় সীতার বনবাস ও আলালের ঘরের দুলালের যে কোন দুইটি পৃষ্ঠা একজন সাধারণ পাঠকের সম্মুখে স্থাপিত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সীতার বনবাসের পৃষ্ঠাখানি পড়িয়া সেই কল্পিত পাঠক সমস্ত রসটুকু গ্রহণ করিতে পারিবে এবং কোন শব্দ তাহার বুদ্ধির অতীত হইবে না। আলাল-সম্বন্ধে ঠিক ইহার বিপরীত অভিজ্ঞতা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আলালের সাহিত্যরস ও ভাষা দুই-ই আমাদের কল্পিত পাঠকের পক্ষে দুরূহ হইবে। এরূপ হইবার কারণ দুইটি—প্রথমতঃ, আলালে ফার্সি শব্দের ছড়াছড়ি। ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত ফার্সি এদেশের আদালতের ভাষা ছিল—আর ১৮৫৮ সালে আলাল প্রকাশিত। কাজেই ১৮৫৮ সালের পাঠকের পক্ষে যে সব ফার্সি শব্দ অনায়াস ছিল এখন আর তাহা নাই। আলালের দুরূহত্বের আরও একটি কারণ এই যে, 'আলালের' ভাষার মূল ভিত্তি কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষা। এই উপভাষা প্রথম সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইবার ফলেই তৎকালীন কলিকাতাশ্রয়ী পাঠক-সমাজের আলাল বড়ই মুখরোচক লাগিয়াছিল, কিন্তু ঠিক এই কারণেই কি ইহা বৃহত্তর বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট দুর্বোধ্য মনে হইবে না? চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্টের একজন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে আজ কোন্ বইখানা সহজবোধ্য? সেকালে বাঙালী শিক্ষিতসমাজ সঙ্কীর্ণ ছিল এবং প্রধানতঃ কলিকাতাশ্রয়ী ছিল বলিয়াই তাহারা সানন্দে আলালকে লুফিয়া লইয়াছিল, কিন্তু আজকার বাঙালী পাঠকসমাজ সমস্ত প্রদেশব্যাপী, এমন কি প্রদেশের বাহিরেও বহু লক্ষ বাঙালী পাঠক আছে। তাহাদের নিকটে কোন বিশেষ স্থানগত বা কোন বিশেষ কালগত উপভাষার আদর হওয়া সম্ভব নয়। আলালের ভাষা তৎস্থানিক ও তৎকালিকের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। আর রামচন্দ্রের কাহিনী ও সংস্কৃত ভাষার যুগল সূত্রে গ্রথিত হইবার ফলে সীতার বনবাসের ভাষা তৎস্থানিক ও তৎকালিকের উর্দ্ধে উন্নীত হইয়াছে।

আরও একটি কথা। দেশী শব্দ ও সংস্কৃত শব্দের মধ্যে টানাটানির ফলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা, এমন কি মুখের ভাষা সংস্কৃতের দিকেই কিছু বেশী ঘেঁষিয়াছে। দেশী শব্দের দিকে যদি টেকচাঁদ ঠাকুর থাকেন, তবে সংস্কৃত শব্দের দিকে ব্যাস, বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবধি আছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাল্যকালে কোন কোন ভৃত্য অমুকলোক ব'সে আছেন না বলিয়া বলিত, অমুক

লোক অপেক্ষা করছেন। ভৃত্যের সংস্কৃত শব্দের অনুরাগ দেখিয়া প্রভুরা আড়ালে হাসাহাসি করিত। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—এখন কোন ভৃত্যের মুখে 'অপেক্ষা করছেন' শুনিলে কেহ আর হাসে না, কারণ সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের তালিকায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বাঙলাসাহিত্যের গতি ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের পাকা কূলের দিকেই ঘেঁষিয়া বহিতেছে—ওপারে অবশ্য দেশী শব্দের তীরভূমি দৃশ্যমান, সেখান হইতে হাওয়া আসে, সে হাওয়ায় পাল ফুলিয়া ওঠে, সাহিত্যিকদের নৌকা কখনো কখনো ওপার ঘেঁষিয়া চলে—এ সবই সত্য। কোন কোন সাহিত্যিক ওপারঘেঁষা হইলেও মূল নদীটা ক্রমেই সংস্কৃতের দিকে গড়াইতেছে। রবীন্দ্রনাথ দেশী শব্দের আনুকূল্য করা সত্ত্বেও যত সংস্কৃত শব্দ উপমা-অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তত সাহস করেন নাই, সংস্কৃত ভাষার কবিদের মধ্যেও এরূপ দাবী খুব বেশী জনে করিতে পারেন না। মাইকেলের নামে অপবাদ আছে যে, তিনি বহুল সংখ্যায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করিলে বলিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ যখন সংস্কৃত শব্দাম্বুধিতে ঝাঁপ দিয়াছেন, তখন মাইকেল তীরে বসিয়া কেবল নুড়ি কুড়াইয়াই সন্তুষ্ট।

আলালের লেখক আজ বাঙলাসাহিত্যের সেই কূলে দণ্ডায়মান যেখান হইতে নদী সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই কারণেই তাঁহার পূর্ববর্তী বিদ্যাসাগর আজ স্পষ্টতর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষাও বোধ করি অধিকতর বোধগম্য। এখন অনেক চর ভাঙিতে পারিলে, রৌদ্রচিক্কণ অনেক নিরর্থক বালুকাস্তূপ পার হইতে পারিলে তবেই আজ টেকচাঁদের নিকটে পৌছানো সম্ভব। দূরাপহৃত টেকচাঁদ আজ বাঙলাসাহিত্যের চেয়ে অধিকতরভাবে বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইংরাজশাসনের স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ ফল ভারতীয় চিত্তের পুনর্জাগরণ। এই পুনর্জাগরণের আবার শ্রেষ্ঠ ফল ভারতীয় সাহিত্যের উদ্দীপ্তি। ভারতীয় সাহিত্য বলিলাম বটে; কিন্তু বাঙলাসাহিত্য বলাই উচিত ছিল কিম্বা বাঙলাসাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্য বলা বোধ করি অন্যায় না, কারণ রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যকে বাদ দিলে বাঙলাসাহিত্যের প্রাণরস ভারতীয়ত্ববোধ। সেই হিসাবে বাঙলাসাহিত্য মূলত ভারতীয় সাহিত্য। পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের সংঘাতে জাগ্রত ভারতীয় চিত্তের আত্মবিকাশের একটিমাত্র পন্থা ছিল—সে পথ সাহিত্যের পথ। অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এই রকম সন্ধিসংঘাত বিচিত্র পন্থায় তাহাদের আত্মবিকাশ ঘটিয়াছে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমকালীন ইংরাজসমাজ যেমন বেকন ও শেক্সপীয়র-প্রদর্শিত চিন্তা ও অনুভূতির দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি ড্রেকের নৌ-পরিক্রমা পৃথিবী বেষ্টন করিয়াছিল, র‍্যালে নূতন জগতে নূতন জনপদ স্থাপন করিয়াছিল, ইংলণ্ডের পশম ইউরোপের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং সকলে মিলিয়া স্পেনের নাবিকশক্তিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু পরাধীন ভারতের সম্মুখে এই সব বহির্মুখী পন্থা ছিল না, কেবল তাহার 'ভিতর কপাট-টি' খোলা ছিল। ভারতীয় চিত্তের, বাঙালী চিত্তের বলিলে অন্যায় হইবে না, সমস্ত শক্তি এই অন্তর্মুখী পথে প্রবাহিত হইল। অত্যল্প কালের মধ্যে সম্পদশালী বাঙলাসাহিত্য গড়িয়া উঠিল। এ যেমন লাভ, তেমনি ক্ষতির খাতাতেও কিছু আছে। বহির্জগতের অভিজ্ঞতাহীন বাঙলাসাহিত্য প্রধানতঃ অন্তর্মুখী হওয়াতে সাহিত্য দুর্বলরূপে দেখা দিল। বাঙলাসাহিত্য এই কারণেই মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গৌরবসত্ত্বেও, খানিক পরিমাণে অবাস্তব, খানিক পরিমাণে পঙ্গু; এই সাহিত্যে যেমন তন্ময়তা, মন্ময়তা আছে, তেমন জগন্ময়তা নাই; এই কারণেই বাঙলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লিরিক, মন্ময়চিত্তের গান, বাঙলাসাহিত্যের নাটক, উপন্যাস প্রভৃতিতে যে পরিমাণে মন্ময়তা আছে, সে পরিমাণে জগন্ময়তা নাই, এমন কি বাঙালীর রাজনীতিও মন্ময়।

কিন্তু ইতিহাসের রহস্য এই যে, পাশ্চাত্য চিত্তের আঘাতে প্রথমে আমাদের সাহিত্য-বোধ জাগ্রত হয় নাই, প্রথমে জাগিয়াছিল আমাদের কর্মোদ্যম। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি সকলেই প্রধানতঃ কর্মীপুরুষ। রচনাতে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন, ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা, ইংরাজিশিক্ষার প্রচলন, নূতন পাঠ্য পুস্তক রচনা প্রভৃতিতেই ইঁহাদের ব্যক্তিত্বের ও শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

ও রামমোহনের গদ্যরচনা, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যান, বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান সমন্বিত সীতার বনবাস—কোনটিই সাহিত্যের প্রেরণায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশের তাগিদে রচিত নহে, ইহাদের জন্ম প্রয়োজনের তাগিদে ; এই সব গ্রন্থ পূর্বোক্ত কর্মীপুরুষদের কর্মেরই সূক্ষ্ম রূপান্তর, এই সব গ্রন্থ তাঁহাদের কর্মেরই মন্ময় প্রক্ষেপ। ইহাদিগকে কর্মের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হইবে, ইহাদের সাহিত্যিক গুণ আছে, কিন্তু ইহারা সাহিত্য নয়। কাছাকাছি আসিয়া মধুসূদন প্রথমে বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছায় শর্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমা লিখিলেন। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ—এখানিও বিশুদ্ধ আত্ম-প্রকাশের রচনা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-সমাজ নব-জাগ্রত কর্মোদ্যমের সহায়ে সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কর্মক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সার্থকতাও লাভ করিয়াছিল, সহসা তাহার পন্থা পরিবর্তনের এমন কি কারণ ঘটিল? কর্মীসমাজ সাহিত্যিক সমাজ হইয়া উঠিতে গেল ইতিহাসের কোন্ দুর্মোঘ বিধানে? জগন্ময়তায় যাহার সূচনা, মন্ময়তায় তাহার অবসান কেন? আমার মনে হয় ইহার প্রধান কারণ এই যে, বাঙালীসমাজ এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে পরাধীন, কর্মের পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপায় তাহার নাই ; সে ইতিমধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, ড্রেক, র‍্যালে, এসেক্স হইবার পথ পরাধীন জাতির পথ নয় ; সে বুঝিয়াছিল যে, একমাত্র সাহিত্যের পথটাই তাহার সম্মুখে অবারিত, বুঝিয়া সে সাহিত্যের পথ ধরিল, একটা সমগ্র সমাজের আত্ম-প্রকাশের মোড় ঘুরিয়া গেল, আবার একটা সমগ্র সমাজের আত্মার প্রবাহ সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ খাতে আসিয়া পড়িয়া অনতিকাল মধ্যে তাহাকে দুস্তর করিয়া তুলিল। সঙ্কীর্ণ খাল প্রবল নদনদী হইয়া উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙলাসাহিত্যও অনুরূপ একটা ব্যাপার।

মধুসূদন-পূর্ববর্তী সমস্ত বাঙালী লেখককেই মূলতঃ কর্মী ধরিয়া লইয়া বিচার করিতে হইবে। কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রচুর সাহিত্যকীর্তি সত্ত্বেও মূলতঃ তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না। সুপাঠ্য, সুষম, শিল্পোত্তীর্ণ রচনা লিখিলেই সাহিত্যিক হয় না, তবে নেপোলিয়ান সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার পত্রাবলীর স্টাইল বিজ্ঞ সমালোচকদের মতে ফরাসী সাহিত্যের একটি স্থায়ী বস্তু, তাহা এমন সুন্দর যে অননুকরণীয়। কিন্তু তবু যে নেপোলিয়ান সাহিত্যিক নহেন, তাহার কারণ তাঁহার পত্রাবলীর মূলে সাহিত্যিক প্রেরণা নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার মূলেও সাহিত্যিক প্রেরণা নাই ; আছে কর্মোদ্যম, আছে সমাজসংস্কারের ইচ্ছা। হুতোম পেঁচার নক্সা সাহিত্য কিন্তু হুতোম স্বয়ং সাহিত্যিক নহেন।

টেকচাঁদ ও হুতোম দুজনেই ব্যঙ্গ-লেখক, দুজনের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত মন্তব্য খাটে, বস্তুতঃ সমস্ত ব্যঙ্গ-লেখক সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। ব্যঙ্গ-লেখকগণ মূলতঃ কর্মী। সুইফট, ভলটেয়ার, রাব্‌লে কর্ম-কুশলী ব্যক্তি ছিলেন ; অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেখিতে পাই যে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম বিচিত্র কর্মীপুরুষ। টেকচাঁদ ও হুতোমও মূলতঃ কর্মীপুরুষ। তৎকালীন নব-জাগরণের কর্মোদ্যমের বিকার আলাল ও

হুতোম পেঁচার নক্সা। একদিকে কর্মোন্তম বিশুদ্ধ শিল্পোন্তমের পথে মোড় ঘুরিতেছিল, অন্যদিকে টেকচাঁদ ও হুতোম উদ্দেশ্যের বিকার না ঘটাইয়া তাহাকে সাহিত্যের পথে চালিত করিতেছিলেন। ব্যঙ্গ-রচনা প্রচ্ছন্ন কর্মস্পৃহা, সে শিল্পজগতের বৃহন্নলা, নাচ শেখায় বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কখনো বিস্মৃত হয় না, এমন কি উত্তর গো-গৃহের রণক্ষেত্রে সারথিমাত্র হইয়াও সে রথীর কাজ করিতে থাকে। জগন্ময়তা ও তন্ময়তাকে হাইফেনের দ্বারা যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ব্যঙ্গ-শিল্প। মূলে সে কর্মী, ফলে সে সাহিত্যিক।

কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪০ সালে, ত্রিশটি বৎসরমাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। হুতোম পেঁচার নক্সা ১ম খণ্ডের প্রকাশের কাল ১৮৬১। তখন লেখকের বয়স একুশ বৎসরের অধিক নয়, রচনার বয়স আরও কম হওয়াই সম্ভব। লেখকের বয়সের কথা মনে রাখিয়া তৎকালিক সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকে যখন নক্সার বিচার করিতে বসি তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যদিচ হুতোম আলালের অনুকরণে লিখিত, লেখক নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যদিচ আলালের গল্পের আকর্ষণ হুতোমে নাই, তবু হুতোমের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রবীণ টেকচাঁদ স্বোদ্ভাবিত পথে যেখানে অত্যন্ত সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছেন, তরুণ কালীপ্রসন্নের অকৃপণ আগ্রহ সেখানে আতিশয্য সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। হুতোমের চলতি ভাষায় আতিশয্য, বর্ণনায় আতিশয্য, Realism বা জগন্ময়তায় আতিশয্য, আতিশয্যের টানেই অবাঞ্ছিত, অনাবশ্যক অশ্লীলতা জোয়ারের মুখের আবর্জনার মতো নক্সার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আতিশয্য তরুণের ধর্ম, কেবল কালীপ্রসন্ন তরুণ ছিলেন না, তৎকালীন নবজাগ্রত ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালীসমাজটাই তরুণ ছিল, নিজেদের তাহারা বলিত ইয়ং বেঙ্গল, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিধি সঙ্কীর্ণ করিয়া ইয়ং ক্যালকাটাও বলিত। হুতোম পেঁচার নক্সায় একখানি ছবি আছে—একটি ভূগোলকের পৃষ্ঠে বসিয়া ঝুঁটি বাঁধা মনুষ্যাকৃতি হুতোম নক্সা উড়াইতেছে, পাখাওয়ালা কতকগুলি নক্সা আকাশে উড্ডীন, একখানি হুতোমের হাতে উড়িবার মুখে। ছবিখানির নীচে লিখিত "হুতোম প্যাঁচা আশমানে বসে নক্সা উড়াচ্ছেন।" এই চিত্রখানির প্রকৃত মর্ম কি জানি না, তবে ছবিখানিতে কালীপ্রসন্নের মর্মকথা চিত্রিত হইয়াছে কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে না। কালীপ্রসন্ন এই বইখানিতে যে কেবল নক্সা উড়াইতেছেন এমন মনে করা উচিত হইবে না, তাঁহার অধিকাংশ কাজই প্রচ্ছন্ন নক্সা-ওড়ানো, তাহার একদিকে আন্তরিকতা, একদিকে ব্যঙ্গ। মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইবার পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মানপত্র পাঠের পরে-মধুসূদনকে তিনি একটি রূপার পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মধুসূদনকে পানপাত্র উপহার! ইহা কেবল হুতোমের মাথাতেই আসিতে পারিত। ইহা কি তাঁহার একটা নক্সা-ওড়ানো নয়? তাঁহার সম্বন্ধে সত্যেন দত্তর যে কবিতাটি আছে তাহাতে উচিত মূল্য দিয়া ব্রাহ্মণগণের টিকি কাটিয়া প্রদর্শন ও রক্ষা করিবার উল্লেখ আছে। এ ঘটনা কতদূর সত্য জানি না। তবে হুতোমে দু'এক ব্রাহ্মণের শিখাকর্তনের উল্লেখ দেখিতে পাই। ব্যাপারটা

সত্য হইলে বিস্মিত না হইয়া মনে করা উচিত যে, ওটাও আর একটা নক্সা-ওড়ানো। নানা-ভাবের নক্সা উড়াইতে উড়াইতে কালীপ্রসন্ন নিজের জীবন ও অর্থ দুই-ই উড়াইতেছিলেন, এক বাঙলা মহাভারত অনুবাদে, মুদ্রণে ও বিতরণেই প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নক্সা উড়াইবার খরচ বড় কম নয়। দেশহিতকর নানাবিধ কাজের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন, খরচ করিতেন, তাঁহার সেই সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস আছে হুতোমের নক্সায়। হুতোম পেঁচার নক্সা শুধু, কালীপ্রসন্ন সিংহের কর্মজীবনের ডায়ারী নয়, বইখানা তৎকালীন কলিকাতার সামাজিক গেজেট। এমন মূল্যবান সমসাময়িক দলিল আর অধিক নাই। কালী-প্রসন্ন মূলতঃ কর্মী বলিয়াই নক্সামাত্র রাখিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ সাহিত্যিক হইলে নক্সা মূলে নির্মিত অট্টালিকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

মদনমোহন তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া জীবনকালে কবিখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মেঘদূত, কুমারসম্ভব, দশকুমার চরিত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যসম্পাদন করিয়া রসিক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার একমাত্র পরিচয় 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতাটি। স্বরচিত শিশুশিক্ষা নামে বর্ণপরিচায়ক যে গ্রন্থে এই কবিতাটি সন্নিবেশিত, সেই বইখানাও নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া লোপ পাইয়াছে—এতবড় যে পণ্ডিত তাঁহার একমাত্র চিহ্নস্বরূপ ওই শিশুরঞ্জক সরল কবিতাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এ যেন ভীমসেনের কৌরব-নিধনশীল গদাটির আজ চিহ্নই নাই, আছে তাহার খেলাঘরের একান্তে বালককালের চুষি-কাঠিখানা মাত্র। আবার মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-কাহিনীও আজ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এমন যে হইয়াছে, তাহার কারণ তিনি বিদ্যাসাগরের ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার ও বিদ্যাসাগরের জীবন সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশা হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত, অনেক কীর্তিকলাপের মধ্য দিয়া সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, বৃহত্তর পুরুষের ঘনতর ছায়া মদনমোহনের উপরে পড়িয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়াছে, তাই আজ তাঁহাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির ফাঁকে ফাঁকে তাঁহাকে নজরে পড়ে মাত্র। ইতিহাস সর্বোত্তমকে মনে রাখে, দ্বিতীয়কে মনে রাখিবার স্থান তাহার সোনার তরীতে নাই। ইতি-হাস নানা নমুনার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা গড়িতেছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ফলগুলিকেই সে রক্ষা করে—অপরগুলি কালের ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে স্থান পায়। মদনমোহনের জীবন ও কার্য্য-কলাপ বিদ্যাসাগরের জীবনপরিধি হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইলে অধিকতর উজ্জ্বলতায় এবং স্বকীয় মহিমায় হয়তো ভাস্বর হইয়া থাকিত। কিন্তু ঘটনাচক্রের অমোঘ আবর্তনে তিনি আজ বিদ্যাসাগরের understudy বা অনুষঙ্গ মাত্র।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম ১৮১৭ সালে। ১৮২৯ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ বছরেই বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তারপরে দুইজনে একই শ্রেণীতে একই বিষয়সমূহ পড়িতে পড়িতে ১৮৪২ সালে বিদ্যালয়-জীবন সমাপ্ত করেন। দুই-জনেই জজ পণ্ডিতের সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন।

তারপর হিন্দু কলেজের সংস্কৃত পাঠশালা, বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থানে মদনমোহন অধ্যাপনা করেন। মনে রাখিতে হইবে এই সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করিবার সময়ে সর্বদাই তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ঘন বা ঘনতর ছায়ায় বাস করিতে হইয়াছে—সংস্কৃত কলেজে কাজ করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন

কলেজের সহকারী সম্পাদক। ১৮৫০ সালে মদনমোহন শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিলে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত এবং ১৮৫৫ সালে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার মৃত্যু। শিক্ষাবিভাগ ও কলিকাতা ত্যাগ করিবার পরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব হইতে তিনি দূরে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে যৌবনের শক্তি অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে, কর্মোৎসাহেও ভাঁটা পড়িয়াছে এবং অবশেষে অকালমৃত্যু আসিয়া সমস্ত সম্ভাবনার অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, মদনমোহন স্বকীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার মতো সুযোগ লাভ করিতেই পারেন নাই।

মদনমোহনের নাম অপর যে দুটি মহৎ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, সে দুটিতেও বিদ্যা-সাগর স্ব-কালে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার ও বিধবা-বিবাহপ্রচলন প্রয়াসের সহিত মদনমোহনের নাম জড়িত। ১৮৪৯ সালে বীটন (বেথুন) সাহেব কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমান বেথুন কলেজ) স্থাপিত হয়। যে কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালী এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, তন্মধ্যে মদনমোহন একজন। "তিনি নিজের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিনা বেতনে প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের শিক্ষাদান করিয়াছেন এবং শিশু-শিক্ষা রচনা করিয়া তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন।" তাহা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারকল্পে প্রবন্ধাদিও তিনি লিখিতেন।

বিধবা-বিবাহপ্রচলন বিষয়ে মদনমোহন যে বিদ্যাসাগরের সহায়ক ছিলেন, এমন মনে করিবার কারণ আছে। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যগণ খুব সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার' কাগজে বিধবা-বিবাহসমর্থক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' প্রভৃতি পরাশরী উক্তি ঐ কাগজেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন এই শ্লোকগুলি 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার' পত্রের লেখকদের হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়াছিলেন। একবার রামগোপাল ঘোষের 'লোটাস' নামক স্টীমারে রাম-গোপাল, রাজনারায়ণ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এখন শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অনুমান কতদূর সত্য জানি না, তবে বিদ্যাসাগর-বান্ধব মদনমোহনের পক্ষে বিধবা-বিবাহের সমর্থক হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

'লোটাস' স্টীমারের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মদনমোহনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একান্ত হৃদয়গ্রাহী। ঐটুকু পরিচয়ে রাজনারায়ণ বসুর পরিহাসের বিদ্যুৎ ঝলকে অন্তত একবারের জন্য, বিদ্যাসাগরের ছায়ায় আচ্ছন্ন মদনমোহনকে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে; চোখে পড়ে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া নয়, সমাজ-সংস্কারক বলিয়া নয়, নিতান্তই মানুষ বলিয়া মনে হয়, হাত বাড়াইয়া করমর্দন করিতে ইচ্ছা জাগে। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখিতেছেন যে, লোটাস-যাত্রিগণ মালদহে পৌঁছিয়া গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তিনি

লিখিতেছেন—"ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিভিল সার্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় Dr. Elton হইবে। এক হস্তীর উপরে রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপরে আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন, কোট ও পেণ্টলুন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর ফর করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশ্যটি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি সায়েস্তা ছিল। অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন।"

নবীন সেন

নবীন সেনের কবি-কৃতির মূল্য-নিরূপণ আজ সহজ নয়। এক কালে লোকে সত্যসত্যই তাঁহাকে মহাকবি অর্থাৎ মহাকাব্য রচয়িতা কবি বলিয়া মনে করিত। এখন তাঁহার সে খ্যাতিতে আর কেহ বড় বিশ্বাস করে না। মেঘনাদ-বধ কাব্য প্রকাশিত হইবার পরে মাইকেলের অনুকরণে মহাকাব্য রচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল; যে আর কিছু পারিত না, সে অন্ততঃ একখানা মহাকাব্য রচনা করিত। এই সব কাব্যের একখানাও মহৎ কাব্য নয়, বৃহৎ কাব্য মাত্র। কোন একটা সমাজে বা যুগে একাধিক মহাকাব্য রচিত হয় না। যুগের সমস্ত সম্ভাবনা ঐ একখানি কাব্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারতের পরে এদেশে বহুকাল আর মহাকাব্য রচিত হয় নাই। কালিদাস প্রমুখ কবিগণের কাব্য খণ্ডকাব্য। মধ্যযুগে তুলসীদাস রামচরিতমানস লিখিয়াছেন বটে। প্রাচীন বাঙালী-সমাজের মহাকাব্যের সম্ভাবনা কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে অবলম্বন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিল। বৃটিশশাসনের পরে বাঙালীসমাজে যে নূতন সম্ভাবনার সঞ্চার হইয়াছিল মেঘনাদ-বধ কাব্য তাহার একমাত্র যোগ্য আধার। তৎসত্ত্বেও মেঘনাদবধ খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী ঐ কাব্যকে মহাকাব্য বলিয়া সান্ত্বনালাভ করেন বলিয়া আমরা ঐ নাম ব্যবহার করিলাম। মেঘনাদের পরে যে-সব মহাকাব্য নামধেয় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সে-সব মাইকেলের শিল্পের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, ফলে সে সমস্ত পাঠক-সাধারণের স্মৃতিতে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, এবং নবীন সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এখনও গ্রন্থাকারে প্রচলিত আছে সত্য—কিন্তু তাহা কত পরিমাণে কবির প্রতিভায় আর কত পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্তির কৃপায় বলা কঠিন।

নবীন সেনের অবকাশরঞ্জিনী, অমিতাভ, অমৃতাভ প্রভৃতি কাব্য আজ আর কে পড়িয়া থাকে? তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ এখনো লোকে পড়ে। তার কারণ পলাশীর যুদ্ধ অনেক স্থলেই বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ড কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ। আরও একটি কারণ এই যে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে পলাশীর যুদ্ধ আজিও আমাদের মনে সজীব। ঐতিহাসিক পটভূমিকাই উক্ত কাব্যকে এখনও স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমার নিজের ধারণা এই যে কবি নবীন সেনের সব চেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ কাব্য নয়, পঞ্চখণ্ডে সমাপ্ত আমার জীবন। তৎকালীন সামাজিক দলিল হিসাবে ঐ গ্রন্থ স্মরণীয়—আর অধিকতর স্মরণীয় নবীন সেনের ব্যক্তিত্বের টীকাভাষ্যরূপে। নবীন সেনের বালকোচিত আত্মপ্রিয়তা, নিজের সম্বন্ধে বাস্তববর্জিত অত্যুচ্চ ধারণা, স্থূল আত্মম্ভরিতা বইখানির ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ। নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারো বিশ্বাস উদ্রেক না করিলেও কৌতূহল উদ্রেক করে—অতিশয় স্থূল অহংপ্রিয়তা



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী



কেশব সেন



নবীন সেন



শিবনাথ শাস্ত্রী

শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতুক উদ্রেক করে—কৌতুক ও কৌতূহলের টানে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অনায়াসে পৌছিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ একাধারে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক। আমার জীবন চিত্তাকর্ষক—তাহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের খসড়া। এই সব কারণে তাহা বাঙলাসাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ এবং নবীন সেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

অনেকের বিশ্বাস রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস কাব্যের ত্রিধাস্রোতে মিলিয়া যে মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই নবীন সেনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আধুনিক যুগের মহাভারত। এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক। কাব্য তিনখানি আদৌ কাব্যপদবাচ্য কিনা সে বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে। মহৎ আইডিয়া হইলেই যে মহৎ কাব্য হইবেই এমন স্থির নাই। আইডিয়ার মহত্বে কাব্যকে মহত্ত্ব দিতে সমর্থ হইলে বৃত্রসংহার শ্রেষ্ঠকাব্য হইত। বস্তুতঃ কি কাব্য নয়, বৃত্রসংহার তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আবার মেঘনাদ-বধের মূলে আইডিয়ার কোন মহত্ত্ব নাই—লক্ষ্মণ চোরের মতো লুকাইয়া আসিয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিল—এই তো কাব্যের বিষয়। অথচ ইহাকেই মাইকেলের প্রতিভা অমর রূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। নবীন সেনের কাব্যত্রয় অমর না হইলেও একটি অমর বীজকে বক্ষে লালন করিয়াছে, সেই জন্য সাহিত্যে না হোক, সাহিত্যের ইতিহাসে, সামাজিক দলিলে তাহাদের স্থানাভাব হইবে না বলিলেই মনে করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষা ভারতবর্ষকে এক ও অখণ্ডরূপে, একটি সুমহৎ আইডিয়ারূপে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল। যুগের সেই দৃষ্টি নবীন সেনের ত্রিধা কাব্যে বর্তমান। দৃষ্টির এই ব্যাপকতা সেই যুগেরই বিশেষ লক্ষণ—প্রায় সাধারণ লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেই জন্যই নবীন সেন প্রতিভায় রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সমতুল্য না হইয়াও যুগদৃষ্টিকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 'এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'—এই আদর্শ শিবাজীর মনে সজ্ঞান প্রচেষ্টা হিসাবে ছিল কি না জানি না, খুব সম্ভবতঃ ছিল না। এ আদর্শ উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষার। বাঙালীর মনীষা ইতিহাস-স্রোতের উজানে গিয়া নিজের দৃষ্টি শিবাজীর উপরে আরোপ করিয়াছিল। নবীন সেন এই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণচরিত্রকে ভারতসৌধের মূল স্তম্ভরূপে ব্যবহার করিয়া আর্য্য ও আর্য্যেতর সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া কাব্যত্রয় রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যগুলির শিল্পমূল্য যাহাই হোক, তৎকালীন চিন্তাধারার দলিল হিসাবে মূল্য সামান্য নয়। রামমোহন হইতে চিন্তাধারার মূলস্রোত রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রবাহিত—নবীন সেন কাব্যত্রয়ের বলে সেই যুগধারার মধ্যে আপন স্থান করিয়া লইয়াছেন। অন্য কারণে না হইলেও কেবল সেই কারণেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে।

কেশব সেন

কেশব সেনের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ নয়, কারণ মিশ্র উপাদানে তাঁহার চরিত্র গঠিত। বিচিত্র উপাদান ও মিশ্র উপাদান এক বস্তু নয়; বিচিত্র উপাদান চরিত্রকে সবল করিয়া তোলে কিন্তু মিশ্র উপাদানে গঠিত হইবার বিপদ এই যে বিরুদ্ধমুখী টানাটানিতে চরিত্র অনেক সময়ে একাগ্রমুখিতা হারাইয়া ফেলে। তবে ইহা জোর করিয়া বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষিগণের মধ্যে তাঁহার মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। আজ এ-কথা সহজবোধ্য নয়—প্রমাণ করা তো রীতিমতো কঠিন, তার কারণ, যে প্রতিষ্ঠান ও বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিত্রবেগ প্রকাশ পাইয়াছিল আজ আর তাহাদের পূর্বগৌরব নাই। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দকে ছাড়িয়া দিলে কেশব সেনের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের বেগ আর কাহারো ছিল কি না সন্দেহ। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ নিঃসন্দেহ মহাপুরুষ কিন্তু ব্যক্তিত্ববেগ তাঁহাদের প্রধান লক্ষণ নয়, তাঁহাদের প্রভাব তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ মহিমান্বিত পুরুষ, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি রক্ষণশীল প্রকৃতির, রক্ষণশীলতা ব্যক্তিত্বকে সংহতি দান করে, গতি তাহার ধর্মবিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব সমাজমুখী ছিল না—ঊর্ধ্বমুখী ছিল; ব্যক্তিত্বের বেগে তিনি মনুষ্যত্বের দিকে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; সে ব্যক্তিত্ব এতই বেগবান্ ছিল যে অপর পাঁচজনকে লইয়া তিনি পথ চলিতে পারিতেন না, তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকিত, বিদ্যাসাগর চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব কোন প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করে নাই, বিদ্যাসাগর নামধেয় অপূর্ব ব্যক্তিটিকে সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই সৃষ্টি আজিও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া বিরাজমান। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠান। কিভাবে ব্যক্তিত্বকে একটি human habitation ও name দিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হয়, বৌদ্ধসঙ্ঘ সৃষ্টিকারীদের ন্যায় সে কৌশল তাঁহার সুপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব আজও রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সক্রিয়। কেশব সেনের ব্যক্তিত্ব সে রকম কোন স্থায়ী আধার লাভ করে নাই। পরবর্তীকালের সুভাষচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সুভাষচরিত্র, কেশব সেনেরও শ্রেষ্ঠ কীর্তি কেশবচরিত্র।

১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭২ সালের তিন-আইনী বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়টাকে ব্রাহ্মমনীষীদের কীর্তির ইতিহাস বলা অসঙ্গত হইবে না। ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭২ এই পর্বটাতে ব্রাহ্মসমাজ তাহার প্রভাবের তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রধানতঃ যাঁহার প্রেরণায় ও ব্যক্তিত্বে ইহা সম্ভব হইয়াছিল—তিনি কেশবচন্দ্র

সেন। ১৮৫৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে ফিরিয়া কেশব সেনকে স্বসমাজে পাইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এ মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। প্রগতিবাদের ধাক্কায়, ব্রাহ্ম-আচার্য্যের উপবীতত্যাগের দাবী এবং ব্রাহ্মণেতর আচার্য্যের বেদিতে বসিবার অধিকার—এই দুইটি সমস্যার ফলে কেশব সেন তাঁহার বন্ধুদের লইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইলেন; ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবারে ব্রাহ্মসমাজ বৃহত্তর আসরে আসিয়া দাঁড়াইল—বিচিত্র স্বভাবের লোক আসিয়া তাহাতে যোগ দিল,—এতদিনে ব্রাহ্মসমাজ একটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হইতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখাইল। কেশব সেনের বাগ্মিতায় দেশশুদ্ধ লোক নিজেদের ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী বলিয়া কল্পনা করিত। কিন্তু এ দব-দবা বেশিদিন টিকিল না। প্রস্তাবিত ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল ১৮৭২ সালের তিন-আইন নামে পাশ হওয়ামাত্র সাধারণ লোকের সন্দেহ জন্মিল যে, ব্রাহ্মরা হিন্দু নহে। "বাহিরের লোকের মনে এই কথা দাঁড়াইল যে, ব্রাহ্মেরা বলিতেছে—'আমরা হিন্দু নই।' আদিসমাজ এই কথার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলও আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহারা সামাজিক-ভাবে হিন্দু হইলেও তাঁহাদের ধর্ম উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন একেশ্বরবাদ—সুতরাং তাহাকে ঠিক হিন্দুধর্ম বলা যায় না।···চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্বের ন্যায় নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না এবং যুবক-দলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না।"

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবার উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে,—ইহা একটি বিচিত্র ও অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা। তাঁহার মতে আর কোন লক্ষণের দ্বারা ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা চলে না। বৃটিশ কমন্‌-ওয়েলথ ও হিন্দুসমাজ একই শ্রেণীর সংস্থা। একটা দেশ যে নীতি খুশি অনুসরণ করুক কেবল মাঝে মাঝে সে যে বৃটিশ কমন্‌-ওয়েলথভুক্ত, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল। আচারে-ব্যবহারে এবং বিশ্বাসে যথেচ্ছাচার করিয়াও হিন্দু বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেই সে হিন্দু থাকিয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ সেই হিন্দুস্বীকৃতিতে আঘাত করিয়া নিজের ও হিন্দুসমাজের ক্ষতি করিলেন—এবং তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রাহ্ম-সমাজ 'সমাজহীন সমাজে' পরিণত হইল—দেশের সহিত তাহার যোগ শিথিল হইয়া আসিল, যে-বৃহৎ সমাজ তাহাকে পুষ্ট করিতে পারিত ক্রমে তাহার সহিত যোগ ছিন্ন হইয়া গেল।

ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও কয়েকটি কারণে কেশব সেনের প্রভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। একদা-প্রগতিবাদী কেশব দেবেন্দ্রনাথের সহিত মতভেদ ঘটাইয়া পৃথক হইয়া আসিয়া-ছিলেন—এখন আবার তাঁহার চেয়েও অধিকতর প্রগতিবাদী যুবকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল—মতভেদ ঘটিতে লাগিল। তাহা ছাড়া নরপূজা ও অতিবিক্ত খৃষ্টভক্তিও কেশব সেনের

অপ্রিয়তাবর্দ্ধন করিল। উপাসনান্তে ব্রাহ্মেরা আচার্য্যের পা জড়াইয়া কাঁদিত, বলিত, 'আমার হ'য়ে ভগবানকে একটু বলবেন।' সবশেষে আসিল কুচবিহার—বিবাহের সমস্যা ও অভিনব সমাধান। কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ স্থির করিয়াছিলেন যে ষোল বছর কম বয়সের মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইবে না। এমন সময়ে কুচবিহার রাজার পক্ষ হইতে কেশব সেনের মেয়েকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব আসিল। কেশব সেন রাজি হইলেন—তখন তাঁহার কন্যা অষোড়শ। ব্রাহ্মরা বিস্মিত হইল। কেশব সেন বলিলেন তিনি বাণী পাইয়াছেন। হয়তো পাইয়া থাকিবেন, মহাপুরুষের স্বপক্ষে ভগবান নিয়ম শিথিল করিলেও করিতে পারেন—কিন্তু যুবক ব্রাহ্মগণ এমন পক্ষপাতমূলক আদেশের সারবত্তা মানিতে রাজি হইল না। ইহার পরেই একদল ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতেই কেশব সেনের সামাজিক প্রভাব একেবারে লোপ পাইল—কিন্তু ব্যক্তি কেশব লোপ যে পাইল না তাঁহার কারণ, খাদ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিটি স্বর্ণময় ছিল। কেশব সেন যথার্থ ভক্ত ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন।

কেশব সেনের চরিত্রে মিশ্র উপাদানের উল্লেখ আগে করিয়াছি। কেশব সেন ধর্ম ও রাজনীতির স্বতোবিরুদ্ধে সৃষ্ট। ধার্মিকের রাজনীতিক হইতে বা রাজনীতিকের ধার্মিক হইতে বাধা নাই, কিন্তু চরিত্রের মূলে উপাদান একটিমাত্র হওয়া আবশ্যক—একাধিক হইলে চলিবে না; তবে একটি মুখ্য, একাধিক গৌণ হইবে, বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের চরিত্রে এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মহাত্মা গান্ধী মূলতঃ ধার্মিক—প্রসঙ্গতঃ মাত্র রাজনীতিক। আবার গ্লাড়স্টোন বা কার্ডিন্যাল ম্যানিং মূলতঃ রাজনীতিক, প্রসঙ্গতঃ মাত্র ধার্মিক। কেশব-চরিত্রে ধর্ম ও রাজনীতি সমভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক মুখ্য ও গৌণের নয়। ফলে একটি আর একটির সাহায্যে বর্দ্ধিত না হইয়া পরস্পরে টানাটানি করিয়া নিজেদের ক্ষতি করিয়াছিল। বস্তুতঃ এখনো আমি স্থির করিতে পারি নাই—কেশব সেনে কোন্ প্রতিভা পূর্ণতর মাত্রায় ছিল—রাজনীতির প্রতিভা না ধর্মের? ব্রাহ্মসমাজের কাজ ছাড়াও ছোটবড় বিচিত্র প্রকৃতির কাজ ও প্রচেষ্টার সহিত তিনি নিজেকে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, ভারত আশ্রমস্থাপন, ১৮৭২ সালের তিন-আইনের আন্দোলনসৃষ্টি—সবগুলিই রাজনীতিকের কার্য্য। কেশব সেনের অতিরিক্ত খৃষ্টভক্তির কতখানি খৃষ্টানরাজশক্তির নিকট হইতে সমর্থন-প্রাপ্তির আশায় কে বলিবে? মনে রাখিতে হইবে অন্য কোন ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ইংরাজ রাজশক্তির নিকট এতটা উৎসাহ পান নাই, শোনা যায় তৎকালীন বড়লাট বিশ্বাস করিতেন যে কেশব সেন শীঘ্রই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবেন। আমার নিজের ধারণা কেশব সেন মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, কেবল কালের গুণে স্বপ্রতিভাকে ধর্ম ও সমাজ-সেবার পথে চালিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেমন আমার আর একটি ধারণা এই যে, সুভাষচন্দ্র মূলতঃ ধার্মিক পুরুষ ছিলেন, কেশব সেনের সময়ে তাঁহার জন্ম হইলে ধর্মসাধনায় ও ধর্মপ্রচারে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভা সার্থকতা লাভ করিত।

বাঙলাদেশের উপরে কেশব সেনের প্রভাব এখন ইতিহাসের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু এখনো সজীব তাঁহার ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক তাঁহার কীর্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন—কিন্তু দেশের সাহিত্যিক মন, সামাজিক মন এই রহস্যপ্রিয়, সদালাপী বন্ধুবৎসল প্রতিভাবান্ ব্যক্তিত্বকে সহজে ভুলিবে না। ভক্তি ও রাজনীতি, সরলতা ও দলাদলি, অভিমান ও রহস্যপ্রিয়তা প্রভৃতির মিশ্র উপাদানে বিধাতা এই ব্যক্তিটিকে গড়িয়াছিলেন। বিগতকালের গতগুরুত্ব তর্কবিতর্কের তলে এই চিত্তাকর্ষক চরিত্রটি চাপা পড়িয়া থাকিবে তাহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ভূকম্পে নাড়া-খাওয়া পৃথিবীর গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া যেমন কর্দ্দমরাশি বাহির হইয়া পড়ে তেমনি রত্নখনি আবিষ্কৃত হইতেও বাধা নাই। গত শতাব্দীর বাঙালীসমাজ প্রচণ্ড একটা নাড়া খাইয়াছিল ইংরাজিশিক্ষার আঘাতে এবং তার ফলে সমাজের নিম্নতলের ভালো মন্দ যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙালীসমাজের অন্তরে যে সুপ্ত ধর্মপিপাসা ছিল, তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে ধর্মপিপাসা আর পূর্বতন জপতপ, ধ্যান-ধারণা, আচার অনুষ্ঠান, পূজা ও অর্চনায় তৃপ্তি পাইতেছিল না, নূতন সার্থকতা, নূতন নির্গমন পথ সন্ধান করিতেছিল। এই সূত্রটিরও আদি রামমোহন। তারপরে দেবেন্দ্রনাথ আছেন, রাজনারায়ণ বসু আছেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম হইতেই ইঁহারা এমন একটি আশ্রয় পাইয়াছিলেন যে-ঘাটে শক্ত করিয়া নৌকাকে নোঙর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর কয়েকজন ব্যক্তি প্রথম চেষ্টাতেই এমন সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাঁহারা একাধিক ঘাট পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কোন কোন ব্যক্তিকে সারাজীবন নূতন নূতন ঘাট পরীক্ষা করিয়াই কাটাইতে হইয়াছিল। নরেন্দ্র দত্ত প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের ঘাটে ভিড়িলেন কিন্তু তৃপ্তি পাইলেন না, অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের মহদাশ্রয়ে আসিয়া শান্তি পাইলেন। এই দলের আর একজন কেশব সেন। ধর্মের বাহন পরীক্ষায় তাঁহার জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হইল। তাঁহার অতিরিক্ত খৃষ্টভক্তি এই বাহন পরীক্ষারই একটা পর্ব। ব্রহ্মবান্ধব বাহন পরীক্ষাকারিগণের একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁহার কথা এখন নয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর একটি দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহার বিষয় আলোচনার আগে আর একজন মহাসৌভাগ্যবানের কথা বলিয়া লইতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব ধর্মসাধনার সবগুলি পথকে পরীক্ষা করিয়া রায় দিয়াছিলেন যে, যত মত তত পথ। অর্থাৎ অন্তরে যদি ভক্তি এবং চরিত্রে যদি নিষ্ঠা থাকে, মুঠির মধ্যে হাল-যদি দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে তবে যে স্রোতেই নৌকা ভাসাও না কেন নির্দিষ্ট চরিতার্থতায় গিয়া ঠিক পৌছিবে—এই ছিল তাঁহার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার জন্য যে ধর্ম-প্রতিভা ও ভগবৎ আশীর্বাদের আবশ্যক—তাহা একান্ত অনন্যসাধারণ। রামকৃষ্ণ অসাধারণ, তাঁহার সঙ্গে অপরের তুলনা চলে না। তাঁহার পরীক্ষা অপরের জন্য, নিজের জন্য নয়। অপরের মুক্তির পথ তিনি নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, নিজে তো ছিলেন জীবন্মুক্ত, তাঁহার জন্য সব পথই পথ, কারণ তিনি সব পথের শেষে পৌছিয়াছিলেন। এমন সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। আগে যাঁহাদের নাম করিয়াছি তাঁহাদের সকলের এমন সৌভাগ্য হয় নাই, কেহ কেহ তো ঘাটের পরে ঘাট পরীক্ষা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন মেডিকেলস্কুলে-পড়া ছাত্র; ইস্কুলে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহাধ্যায়ী

এবং ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাগ্রহণে তাঁহার পুরোবর্তী। ইংরাজিশিক্ষার ভূমিকম্পে তাঁহার চিত্ত নাড়া খাইয়া ফাটল ধরিয়াছিল, সে ফাটল আর কিছুই নয়, তৃষ্ণার বদনব্যাদান। কি প্রচণ্ড তৃষ্ণা লইয়াই না তিনি প্রথম দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভাবেন নাই যে, সে ঘাটে তৃষ্ণার পেয় মিলিবে—কিন্তু আশ্চর্য্যভাবেই মিলিল! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখিযাছেন—"ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার পূর্বে আমার সংস্কার ছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংস ভোজন করে।····· সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয়ভাবে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পাপীর দুর্দশা, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া······ আমার সমস্ত শরীর গলদ্ঘর্মে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল। মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্মজীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া আসিলাম। অবিলম্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর নিকট দীক্ষিত হইলাম।" অনভিষ্ট ঘাটে তৃষ্ণার বারি মিলিল। নৌকা ঘাটে ভিড়িল, কিন্তু বেশি দিন থাকিল না।

এই সময়ে কেশব সেনের নেতৃত্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের উপবীতধারণ ও উপবীতত্যাগ সমস্যা লইয়া দারুণ গোল পাকাইয়া উঠিল। এ সমস্যা আজ আমাদের কাছে সমস্যাই নয়, কারণ এযুগের অধিকাংশ লোকেব কাছে পৈতার গুরুত্ব একগাছা সূতার চেয়ে অধিক নয। আড়ম্বরসহকারে পৈতা ত্যাগকরাকেও এযুগের লোকে বাহুল্য মনে করে, এযুগে কেহ পৈতা ত্যাগ করে না, পৈতা আপনি খসিয়া পড়ে। সে যুগে পৈতাত্যাগকারীর দল পৈতার গুরুত্ব মানিত, নতুবা তাহার ধারণ বা ত্যাগ লইয়া এমন আন্দোলন করিতে পারিত না। বিজযকৃষ্ণ লিখিতেছেন—"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ যদি উপবীতধারী হন তবে আমি সমাজকে অসত্যের আলয় বলিযা পরিত্যাগ করিব।" এ বিষয়ে তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—"কি আশ্চর্য্য, যিনি প্রথম বয়সে পৈতাধারী উপাচার্য্যকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়াইবার জন্য এমন উদ্যত, তিনি শেষ বয়সে পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, হিন্দু ব্রাহ্ম, যে-যে ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী সে ঠিক পথেই চলিতেছে, এই কথা বলিয়া কোন ধর্ম বা সমাজের কোন প্রথাকেই নিন্দা কবিলেন না। একেবারে উল্টা প্রণালী ধরিলেন।"

আসল কথা পৈতা রাখা বা ফেলার সমস্যা নয়, আসল কথা বিজয়কৃষ্ণ ঠিক ঘাটে এখানে পৌছান নাই, তাই ভিতরে ভিতরে মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন উপবীতের সমস্যাই বুঝি তাহার কারণ।

অতঃপর মহর্ষিকে ত্যাগ করিয়া গোস্বামী মহাশয় কেশববাবুর দলে ভিড়িলেন, কিন্তু সেখানেও কি দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন! কেশববাবুকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার একটা ঢেউ উঠিল, ভক্ত ব্রাহ্মগণ আচার্য্যের ও পরস্পরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, পাদ্যের সহিত অশ্রু মিশাইয়া পা ধৌত করিতে লাগিল এবং ভগবানের কাছে তাহাদের জন্য একটু সুপারিশ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল—এই ব্যাপারে অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বিজয়কৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া দলত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের নিজ বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, বিজয়কৃষ্ণ আবার কেশব সেনের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু এই মিলনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কেশব সেনের দলত্যাগ করিয়া যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের একজন। এইরূপে আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ তিন সমাজ ঘুরিয়া গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মচক্র আবর্তন সমাপ্ত হইল। এবারে চক্রভেদ করিবার পালা। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন এবং নিজের বিশিষ্ট সাধনার ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এতদিন পরে নৌকা ঠিক ঘাটটিতে আসিয়া ভিড়িল।

দীপ হইতে দীপ জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু তজ্জন্য শিখায় শিখায় যোগ হওয়া দরকার, একের শিখার সহিত অপরের অন্য স্থানের যোগ হইলে চলিবে না। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেন দু'জনেই প্রজ্বলিত দীপশিখা, কিন্তু সে শিখার মুখে গোস্বামী মহাশয়ের নিজ শিখা স্পৃষ্ট হয় নাই। দীপান্তরের শিখার তাপে দীপ তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু তপ্ত হওয়া মানেই দীপ্ত হওয়া নয়। ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণ তপ্ত হইয়াছিলেন—দীপ্ত হন নাই। সে দীপ্তি আসিল পরে।

গত শতাব্দীর ধর্মজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস এক আশ্চর্য্য ও বিচিত্র বস্তু। রামমোহনের জ্ঞানময় ব্রহ্ম, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিরীশ্বরবাদ, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তর সংশয়বাদ, দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদ, রামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়, পজিটিভিস্টগণের জ্ঞানময় নাস্তিক্য, শশধর তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনজাত ধর্ম। অনুশীলনের উপরে বঙ্কিমচন্দ্র এমন গুরুত্ব আরোপ করিতেন যেন সেটা একটা নূতন অবতার! কত মত, কত পথ! আর যাই হোক ঘাটে ঘাটে ঘুরিবার মতো ঘাটের অভাব তখনকার দিনে ছিল না এবং দেখিলাম ঘাট যাচাই করিবার নৌকারও অভাব হয় নাই।

ধর্মমত ও ধর্মপথের গুরুত্ব ও সংখ্যা কালক্রমে হ্রাস পাইল। গত শতাব্দীতে বাঙালীসমাজের প্রাণশক্তির প্রাচীন ধারা আত্মজিজ্ঞাসার খাতে বহিতেছিল, বর্তমান শতাব্দীতে তাহাই বহমান রাজনীতির খাতে। আর শুধু বাঙলাদেশের কথাই বা বলি কেন আধুনিক মানুষের কাছে রাজনীতিই ধর্ম! তাই তো সকলে মিলিয়া রাজনীতিপ্রবাহের দুই দিকে পাকা করিয়া স্ফটিকের ঘাট বাঁধিতে লাগিয়া গিয়াছে। যেদিন নদী ধর্মজীবনের খাতে আবার ফিরিয়া যাইবে, শুষ্ক নদীর তীরে শূন্য ঘাট মানুষের পরিশ্রমকে বিদ্রূপ করিবে অথচ নূতন প্রবাহের অপরিজ্ঞাত জলে নামিবারও পথ পাওয়া যাইবে না, তখন আবার ঘাটের সন্ধানে নাবিকের দল বাহির হইয়া পড়িবে। সংশয় যতই বাড়ে, ভক্তি যে ততই আসন্ন হয়। নদীর এপার যতই দূরে গিয়া পড়ে, অপর পার কি ততই নিকটতর হয় না?



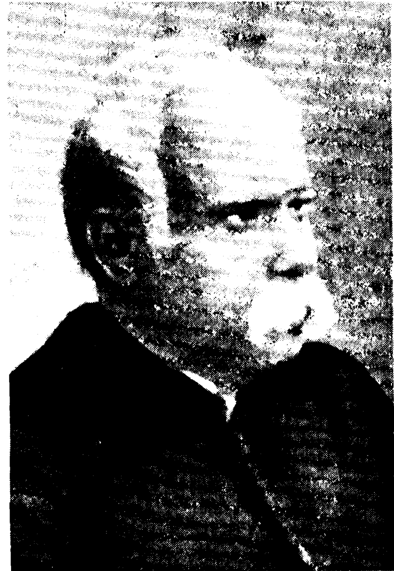
নিবেদিতা



নবগোপাল মিত্র



দুর্গামোহন দাশ



দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশ কেবল সমাজবিশেষের ইতিহাসমাত্র নয়। তৎকালীন বাঙলাদেশের সামাজিক ও মানসিক জগতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সেই কৃতিত্বের অনেকটাই ব্রাহ্মসমাজের। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ডিরোজিওর ছাত্রগণ বাঙলাদেশের নায়ক ছিলেন বলিলে অন্যায় হইবে না। তেমনি আবার ঐ শতকের তৃতীয় পাদের নায়ক হইতেছেন ব্রাহ্মসমাজ—প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের ইতিহাসই তৎকালীন সমাজের ইতিহাস। শতাব্দীর চতুর্থ পাদে নূতন বেগ ও নূতন ধারা বাঙালীসমাজে অভিনব পরিবর্তন সাধন করিতে শুরু করিয়াছিল। এদিকে রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুত্থান, আর একদিকে জাতীয় শক্তির নিছক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবহমানতা—এই দুটি কারণের ফলে বাঙালীসমাজে নূতন ও অভাবিত লক্ষণসমূহে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মমনীষীদের সাধনবেগ সমাজকে যে ধাক্কা দিয়াছিল, তাহার গৌরবকে লঘু করা চলে না।

আমরা ভারত-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত, ভারত-আবিষ্কার আমাদের লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজ সার্বভৌম ও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপিত হইবার ফলে মানুষের মনে ভারত-জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল—ভারত-আবিষ্কারের অভিমুখে শিক্ষিতসমাজের মনকে অজ্ঞাতসারে চালিত করিয়া দিয়াছিল। বলা যাইতে পারে যে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ফল—ব্রাহ্ম-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দান।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মপ্রচারকগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বোম্বাই, গুজরাট ও মাদ্রাজে একাধিকবার প্রচারকার্য্যে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষের মূল সংহতিকে লোকচক্ষে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। আরও পূর্ববর্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উত্তরভারত ভ্রমণে —এই প্রক্রিয়ারই সূত্রপাত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ঐক্য প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মপ্রচারকদের ও তাঁহার প্রচারকার্য্যে মূল প্রভেদটা এই যে সুরেন্দ্রনাথ যখন রাজনৈতিক ঐক্যের উপর ঝোঁক দিয়া প্রচার করিতেন, ব্রাহ্ম-প্রচারকগণ নিগূঢ়তর ঐক্যের উপরে ঝোঁক দিতেন—একটিতে রাজনীতির সার্বভৌমত্ব আর একটিতে ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির সার্বভৌমত্ব। একটি প্রয়োজনের বন্ধন, অপর বন্ধনটি প্রয়োজনাতীত, প্রয়োজন শেষ হইলে প্রয়োজনের বন্ধনকে বাধা বলিয়া মনে হয় আর ভিতরের বন্ধনের সে রকম কোন দায়িত্ব না থাকায় তাহার গুরুত্ব কালক্রমে দৃঢ়তর হইয়া ওঠে। ব্রাহ্ম-সমাজ" ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও সমাজকে ভিতরে ভিতরে সংহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের যেমন গৌরব, ভারতবর্ষেরও তেমনি সৌভাগ্য।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব পরবর্তী ব্রাহ্মসাধকগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭ সালে। তিনি ২৪ পরগণার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান। তাঁহারা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার পিতা পুত্রকে যুগোচিত শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। শিবনাথ যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, তখন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগর এবং সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—এই দুই মনীষী শিবনাথের বাল্যাকাশের যুগল গ্রহ। ইঁহাদের প্রভাবে তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। এম-এ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া শিবনাথ সংস্কৃত কলেজ হইতে শাস্ত্রী উপাধি পান। এই স্বোপার্জিত শাস্ত্রী উপাধির চাপে তাঁহাদের কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য্য বিস্মৃতপ্রায়।

এম-এ পাশ করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই শিবনাথের সংসার-পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। তৎকালের যুবকসমাজের উপরে বহু পরবর্তীকালের সুভাষচন্দ্রের প্রভাবের ন্যায়, কেশব সেনের প্রভাব চৌম্বকশক্তির ন্যায় কাজ করিত। সহপাঠিবন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির মধ্যস্থতায় তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ভিড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাশ্যে উক্ত সমাজে যোগদান ও উপবীতত্যাগ তখনো দূরবর্তী। এই উপলক্ষে যোগদানকালে তাঁহাকে যে পৈত্রিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল—স্মিত কৌতুকের সহিত সে সব শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আত্মচরিতে বিবৃত হইয়াছে।

সমস্ত রকমের নিষ্ঠার সঙ্গেই কিয়ৎ পরিমাণে ডন কুইকসট মনোভাব জড়িত। নিষ্ঠার আতিশয্য Fanaticism, ডন কুইকসট চূড়ান্ত Fanatic। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার সহপাঠি ছিলেন। মহালক্ষ্মী নামে একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবার সহিত যোগেন্দ্রের বিবাহ তিনি স্থির করিলেন। বিধবাবিবাহের ফলে দম্পতি পরিবারকর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। তখন এই নিরাশ্রয়, সহায়সম্পত্তিহীন নবদম্পতির পালনের ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। নিজের স্কলার-শিপের টাকা ইঁহাদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হইতে লাগিল। একতলা হইতে তেতলায় তিনি জল টানিয়া তুলিতেন, প্রয়োজন হইলে বাঁটনা বাঁটা ও বাজার করিয়া আনাও তাঁহার কর্তব্য ছিল। আর এই ভাবে নিজের স্বাস্থ্য ও সময় ব্যয় করিবার ফলে আগামী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনাকেও তিনি ক্ষীণতর করিতে লাগিলেন। এসব কেন? না, তাঁহার বিশ্বাস এই যে, এই বিধবাবিবাহের দায়িত্ব তাঁহারই। ইহাই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা শুকাইয়া উঠিলেই Fanaticism হয়। শিবনাথের হাস্যরসবোধ ছিল বলিয়াই তিনি Fanatic হইয়া ওঠেন নাই। Fanaticদের আর যে গুণই থাক—হাস্যরসবোধ হইতে তাহারা বঞ্চিত। সেকালের অনেক প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের নামে অপবাদ আছে যে, তাহাদের সেন্স অব্ হিউমার্ ছিল না। শিবনাথ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না।

শিবনাথ পিতার একগুঁয়েমির ফলে দুইটি বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া

পত্নী বিরাজমোহিনী পিতৃগৃহে বাস করিতেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে শিবনাথ তাঁহাকে নিজের কাছে সাধনাশ্রমে আনিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবেন—পরে তিনি যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে চান তো করিবেন। এ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—"বিরাজমোহিনীকে বলিলাম—আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোন ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া করো। এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়? তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, মাগো, মেয়েমানুষের আবার ক'বার বিয়ে হয়! তাঁহার ভাব দেখিয়া পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্য্যে করিণত করিতে হইবে।"

সহজাত হাস্যরসবোধ না থাকিলে কেহ নিজেকে লইয়া বিদ্রূপ করিতে পারে না। এখানে তিনি একাধারে ডন কুইকসট ও উক্ত গ্রন্থের লেখক Cervontes। 'আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল!' ইহাকে বলে Fanaticismএর শিরে সর্পাঘাত। সেকালে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের মাথাতেই পোষিত ভূত থাকিত—কিন্তু হাস্যরসের ওঝার অভাবে নামিয়া যাইবার অবকাশ পায় নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী পণ্ডিত, সাধক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান সংগঠক—কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, সর্বজনপ্রিয় হইবার মন্ত্র তিনি জানিতেন, সে মন্ত্র স্মিতকৌতুকের অধিকার, সে মন্ত্র নিজেকে লইয়া বিদ্রূপ করিবার সুদুর্লভ ক্ষমতা।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধনবেগ ধর্মসাধনার পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশ ঐকান্তিক হইবার সুযোগ পায় নাই। যে কয়খানা পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন, পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, একজন সাধককে পাইতে গিয়া কত বড় একজন সাহিত্যিককে আমরা হারাইযাছি। তাঁহার স্বচ্ছ ভাষা, ভাষায় স্মিতকৌতুক, সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান ও পরিপ্রেক্ষিত-চৈতন্য—এসমস্তই দুর্লভ গুণ। এ সমস্ত তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নিঃসন্দেহ বাঙলাসাহিত্যের একখানি স্মরণীয় ও সুপাঠ্য গ্রন্থ —এবং তৎকালীন সমাজের ইতিহাস বিষয়ে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। 'আত্মচরিতের' পাতায় পাতায় তাঁহার অনায়াস আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাঙালীর লিখিত স্বচরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও রচনানৈপুণ্য কদাচিৎ একাধারে দৃষ্ট হয়। শিবনাথে দুই গুণ একাধারে বর্তিয়াছিল। সাহিত্যকে জীবনপন্থা বলিয়া গ্রহণ করিলে বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লেখক তিনি হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইবার ছিল না। লেখক শিবনাথ হইয়াছেন। বিধাতার বিধানকে তিনি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। কতখানি চরিত্রবেগ থাকিলে ইহা সম্ভব অনুমান করাই সহজ নয় —কাজে করা তবে কত কঠিন।

দুর্গামোহন দাশ
ও
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কিয়ংপরিমাণে সমাজবহির্ভূত না হইলে সমাজকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। গাড়ির আরোহীরা গাড়িখানাকে টানে না, গাড়ি-টানার ঘোড়া দুটো কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্টভাবেই গাড়ির সহিত যুক্ত। পূর্ববঙ্গের সমাজ কতক পরিমাণে বাঙালীসমাজের সামাজিক শাসনের বহির্ভূত। পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ নবদ্বীপ হইতে শুরু করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীরে বাঙালীর যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাই বাঙলার স্নায়ুকেন্দ্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে কলিকাতার সমাজই সব দিক দিয়া অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে, কলিকাতার সমাজ কেবল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক শাসনের ক্ষেত্রেও আপন অনুশাসন বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কলিকাতা-সমাজের যখন প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তখনও নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর সামাজিক শাসনের কেন্দ্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এই সামাজিক শাসনকে নিষ্ঠার সহিত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে—কিন্তু পূর্ববঙ্গে তাহার প্রভাব তেমন ঘনিষ্ঠভাবে অনুভূত হয় নাই। পূর্ববঙ্গের সমাজ অক্ষরতঃ সমাজ-কেন্দ্রের শাসনকে স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ যে বিপুল স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাহা কল্পনাতীত। সেই কারণেই বারংবার পূর্ববঙ্গ হইতে অভূতপূর্ব উন্মাদনার ঢেউ অপ্রত্যাশিত-ভাবে পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত স্থাণু সমাজের উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া দিয়াছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এই ঢেউ সমাজ-সংস্কারস্পৃহার আকারে আসিয়াছিল, বিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে আসিয়াছে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের দুর্মদ ইচ্ছার আকারে। উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু মূলে প্রেরণাটা একই, আর এই মূল প্রেরণা যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ পূর্ববঙ্গ অনেকাংশে পূর্বসংস্কারমুক্ত হওয়ায় স্বাধীন ছিল।

ইংরেজিশিক্ষার একটি বাস্তব ফল নারীজাগরণ ও নারীর অবরোধ-মোচন। প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁহার পত্নীর ক্ষেত্রে নারী-জাগৃতির নিয়মের আরোপ করিয়াছিলেন, সেকথা বলিয়াছি; সেকালে অভিজাত ঘরের বধূকে মারাঠী প্রথায় শাড়ী, সেমিজ পরাইয়া, গাড়িতে তুলিয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া জাহাজঘাটে লইয়া যাওয়া একপ্রকার অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। বিশ্বাসের প্রবল জোর না থাকিলে এবং সেই সঙ্গে প্রথম সিভিলিয়ান হইবার অভাবিত সৌভাগ্য না হইলে এমনটি ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু এই ঘটনাটিকে নারী-জাগরণের আন্দোলন বলা চলে না, ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাসের ব্যাপার।

আন্দোলন হিসাবে নারী-জাগরণের ঢেউ যাঁহারা কলিকাতার সমাজে আনিলেন,

তাঁহাদের নিবাস পূর্ববঙ্গ, তাঁহারা পূর্ববঙ্গেরই অধিবাসী। দুর্গামোহন দাস এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭০-এর কাছাকাছি স্থায়িভাবে কলিকাতায় আসিলেন। শতাব্দীর এই চিহ্নটাকেই নারী-জাগরণ আন্দোলনের পূর্বসীমা বলিয়া ধরা উচিত। দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ পূর্ববঙ্গবাসী হিসাবে অনেক পরিমাণে পূর্বসংস্কারমুক্ত এবং সমাজবহির্ভূত ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই সমাজ-শকটে প্রবল টান দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরও নারী-সমাজের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সমাজের লোক। কিন্তু তাঁহারা বহু পূর্বকালে লিখিত শাস্ত্রের নজির স্বীকার করিয়া লইয়া, বহু পূর্বকালের সহিত একাত্মক হইয়া গিয়া প্রায় সমাজ-বহির্ভূত জীবে পরিণত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা কায়িক বিচারে সমাজ-বহির্ভূত না হইয়াও আত্মিক বিচারে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর ও রামমোহন দুজনেই প্রতিভাধর মনীষী। প্রতিভাধর ব্যক্তি সর্বদেশে সর্বকালে কিয়ৎপরিমাণে সমাজ-বহির্ভূত। তাঁহারা সর্বদাই প্রকৃতিদত্ত প্রভূত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের সংস্কারসাধনের সহিত পরবর্তীকালের দু'জনের কীর্তির তুলনা করা বোধহয় সঙ্গত হইল না। সতীদাহ-নিবারণ এবং বিধবাবিবাহ-প্রচলন দেশের আইনের ক্ষেত্রের ব্যাপার—ইহা যেন বহির্বাটীর বিষয়। দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া কাজ করিলেন—ইহা সত্য সত্যই অবরোধভঙ্গের ব্যাপার। নারী-সমাজে ব্যাপকভাবে ইংরেজিশিক্ষার প্রসারণ উচিত কিনা কিংবা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাস্থলে মেয়েরা পর্দার আড়ালে বসিবে না পুরুষগণের সহিত একাসনে বসিবে, এ সব আইন সিদ্ধ হইবার বিষয় নহে, আর আইন দ্বারা সিদ্ধ হইবার নয় বলিয়াই ইহাদের গুরুত্ব অধিকতর। তাহা ছাড়া ইহাদের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় নজিরও সুলভ নহে। রাষ্ট্রের সহায়তায় সমাজের উন্নতিসাধনকে রাজনৈতিক বিষয় বলিয়াই ধরা উচিত। মানসিক সঙ্কল্পের বেগে সমাজের মোড় ঘুরাইয়া দেওয়াই যথার্থ সমাজ-সংস্কার।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা হইতে 'অবলাবান্ধব' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন। কর্মের প্রশস্ততর ক্ষেত্রলাভের আশায় তিনি ১৮৭০ সালে অবলাবান্ধব কলিকাতায় তুলিয়া আনিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি যেমন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাইলেন, তেমনি আবার কাজের চাপও বাড়িয়া গেল। এই সময়ে দুর্গামোহন দাশ হাইকোর্টে ওকালতি করিবার আশায় বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তখন এই দুইজনের উদ্যমে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দিল।

প্রথমেই বিবাদ বাধিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরে উপাসনার আসনসংস্থান ব্যাপারে। "কেশববাবু ইঁহাদের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে মহিলাগণের বসিবার আসন নির্দেশ করিতে যখন বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তখন একদিন দুর্গামোহন দাশ মহাশয় এবং যতদূর স্মরণ হয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয় স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণসহ

মন্দিরের উপাসনাকালে পুরুষ উপাসকগণের মধ্যে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মদলের মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। উপাসকমণ্ডলীর প্রাচীন সভ্যগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া গেলেন।" কিছুকাল আগে কেশব সেন ব্যক্তিগত অধিকারের সীমানা লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি তখন ছিলেন প্রগতিশীল। এখন তাঁহার চেয়েও অধিকতর প্রগতিশীলগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিপদে পড়িবারই কথা। প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করিল। মহর্ষি আসিয়া আগ্রহের সহিত উপাসনা ও আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। মহর্ষি অসাধারণ ব্যক্তি না হইলে একপ্রকার প্রতিশোধমূলক সূক্ষ্ম তৃপ্তি নিশ্চয় অনুভব করিতে পারিতেন।

নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্রে অতঃপর দুর্গামোহন যে কাণ্ডটি করিলেন, তাহাতে যেমন বুকের পাটার আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক সঙ্কল্পের দৃঢ়তার এবং সঙ্গে কিছু পরিমাণ 'কুইকসট-বৃত্তিও অত্যাবশ্যক। দুর্গামোহন দাশ তাঁহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়া ফেলিলেন। কাজটি করা বড় সহজ হয় নাই। একদল কন্যাকে চুরি করিয়া কাশীতে স্থানান্তর করিল, দুর্গামোহন আবার চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং অবশেষে বিদ্যাসাগরের সাহায্যে বাঙলাদেশ তোলপাড় করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। সমস্ত কাহিনীটিকে ডন কুইক্‌সট গ্রন্থের একটি অধ্যায় বলিয়া মনে হয়।

নবগোপাল মিত্র

মানুষের ইতিহাসে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-জাতীয় একটা নিয়ম সক্রিয় বলিয়া মনে হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব বলে যে, প্রকৃতি বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি প্রাণীকে রক্ষা করে, শক্তি সামর্থ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদেরই নাকি প্রকৃতি বাঁচাইয়া রাখে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ শ্রেণীর লোক বা কোন্ শ্রেণীর কীর্তি টিকিয়া যায়? সর্বোত্তমকে রক্ষা করিবার দিকে ইতিহাসের দেবতার তেমন যেন দৃষ্টি নাই, থাকিলে যে-ব্যক্তি অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিল, যে-ব্যক্তি চাকা আবিষ্কার করিয়াছিল অবশ্যই তাহাদের নাম-পরিচয় জানিতে পারিতাম। আমার মনে হয় উত্তম অপেক্ষা বিচিত্রকে রক্ষা করিবার দিকেই ইতিহাসের ঝোঁক, বৈচিত্র্যের দ্বারা পূর্ণতা লাভই ইতিহাসের লক্ষ্য, বহু উত্তমের সমন্বয়ে একটা ধারাকে চরম পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য সে তত ব্যস্ত নহে। বৈচিত্র্যকে রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময়ে ইতিহাস উত্তমকে বর্জন করে, কারণ তাহার সোনার তরীতে স্থান সঙ্কীর্ণ। বৈচিত্র্যকে রক্ষা করাই ইতিহাসের 'প্রাকৃতিক-নির্বাচন'—নতুবা কালস্রোতে যখন সোফোক্লিসের অধিকাংশ অমর নাট্য তলাইয়া গিয়াছে, তখনও ভট্টিকাব্য অচল। কাব্যের উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে নিকর্ষের দৃষ্টান্তরূপেই ইতিহাস ভট্টিকাব্যকে প্রাকৃতিকনির্বাচনে টিকাইয়া রাখিয়াছে, নতুবা সোফোক্লিস বা এস্কাইলসের নাটকের লোপ ও ভট্টিকাব্যের বিদ্যমানতার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিচিত্র খেয়ালের আর একটি দৃষ্টান্ত নবগোপাল মিত্রের ইতিহাস। এই ব্যক্তিটিকে বাঙলাদেশ এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছে, আর কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ ভুলিবে, তারও কিছুদিন পরে যখন মনে করিবে নিতান্ত শক্ত বলিয়াই মনে করিবে। নবগোপাল মিত্রকে কোন দিক দিয়াই উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালীগণের সমকক্ষ বলা যায় না, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ধারে-কাছেও তিনি ঘেঁষিতে পারেন না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি স্মরণীয়, তার কারণ আর কিছুই নয়, নিজে মহৎ না হইয়াও একটি মহৎ চিন্তাধারা ও কর্মপ্রবাহের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। যে-ব্যক্তির মহত্ত্ব সহজাত সে অপর সকল হইতে দূরে দাঁড়াইয়াও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে ব্যক্তিত্বে ও শক্তিত্বে তাহারা মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু ঘটনা-চক্রের বা নিজের মতিগতির ফলে তাহারা একটা কর্মপ্রবাহের মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়া বিশিষ্টতা লাভ করে। তাহাদের প্রাধান্য দেশকালপাত্রের উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। নবগোপাল মিত্র সেই শ্রেণীর লোক। তিনি যে-বিশেষ সময় যে-বিশেষ পরিবেশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাহার বাহিরে খ্যাতিলাভ করা বা বিশিষ্টতা অর্জন করা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়া উঠিত না।

নবগোপাল মিত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী কাজেই তাঁহার সময়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তখন চারিদিকে স্বদেশী ও 'ভারতীয় স্বদেশী'র হাওয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে। রামমোহন যে ভারতবর্ষকে আত্মিক ধ্রুবতারারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই সময়টাতে ছোট বড় মাঝারি অনেক নৌকা সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া পাল তুলিয়া দিয়াছিল, নবগোপাল মিত্র সেই বহরের প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন। সেকালে তাঁহার নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল 'ন্যাশানাল নবগোপাল।' একজন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার 'ন্যাশানাল ধাত' ছিল। "এইবারে হিন্দু-মেলার সম্বন্ধে গল্প বলি শোনো। একটা ন্যাশানাল স্পিরিট কী ক'রে তখন জেগেছিল জানিনে কিন্তু চার দিকেই ন্যাশানাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এটা হচ্ছে আমার জেঠা মশায়দের (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বাবা মহাশয় তখন ছোট। নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতো ন্যাশানাল নবগোপাল, তিনিই প্রথমে ন্যাশানাল শব্দ শুরু করেন। তিনিই চাঁদা তুলে 'হিন্দু-মেলা' শুরু করেন।" হিন্দু-মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন—"অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" এই মেলার জন্য সঙ্গীত রচিত হইল—"মিলে সবে ভারতসন্তান," "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" নবগোপাল মিত্রের কাগজের নাম 'ন্যাশানাল পেপার।'—এই মেলার উদ্দেশ্য, সঙ্গীতের মর্ম, সংবাদপত্রের নাম প্রভৃতি হইতে একটা বিষয়ে বুঝিতে পারা যায় যে তখন সকলেই 'ন্যাশানাল' ও ভারতকে সমার্থক বলিয়া জানিত, তাহারা ভারতবর্ষকেই নেশন বলিয়া জানিত, অন্য কোন ক্ষুদ্রতর সত্তার অস্তিত্ব তাহাদের কল্পনাতেও ছিল না। "নবযুগের গোড়া পত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চারদিকে ভারত, ভারত, ভারতী কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হ'ল তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখল।"

এতখানি হয়তো সবাই স্বীকার করিবেন না, কারণ ইহার আগে রামমোহন রায়ের মনীষা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔপনিষদ-প্রবাহ প্রভৃতি পূর্বসূত্র রহিয়াছে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে এপর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, প্রধানতঃ নবগোপাল মিত্রই পূর্বসূরিগণের সাধনাকে সাধারণের জীবন-ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিলেন, এতকাল যাহা ছিল ব্রহ্মসভাতে বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, এবারে তাহা আসিয়া দাঁড়াইল হিন্দু-মেলার প্রশস্ত আসরে। এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব—এবং এ বড় অল্প কৃতিত্ব নহে।

বর্তমান বাঙলাদেশ যে নবগোপাল মিত্রকে ভুলিয়াছে তার কারণ বর্তমানে বাঙলাদেশ ভারতবর্ষকেই ভুলিতে বসিয়াছে। হৃৎপিণ্ড একবার প্রস্ফারিত, একবার সঙ্কুচিত হইয়া ক্রিয়া করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি পর্য্যায়ক্রমে আত্মপ্রসার ও আত্মসঙ্কোচের ধাক্কা আছে। এখন আত্মসঙ্কোচনের পালা চলিতেছে, তাই নবগোপাল মিত্র বিস্মৃত, এই ক্রিয়া আরও তীব্র হইলে লোকে তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু তারও পরে, হয় তো দীর্ঘকাল পরে আবার যেদিন আত্মপ্রসারের দিন আসিবে, তখন এই বিস্মৃত ব্যক্তিটির সন্ধান পড়িয়া যাইবে,

আত্মপ্রসারের ক্রিয়া চরমে উঠিলে দেশের লোকে তখন নবগোপাল মিত্রের উদ্দেশে মূর্তি মন্দির ইমারত রচনা করিয়া দিবে। কিন্তু তার এখন অনেক বিলম্ব—এখনও সঙ্কুচনের ক্রিয়া চরমে আসিয়া পৌছায় নাই। কেবল প্রাদেশিকতাবোধের ভাঁটায় ঘাটের অস্থিপঞ্জর ও নদীগর্ভের পঙ্ক-কৰ্দ্দম বাহির হইতে শুরু করিয়াছে, এখনও জল অনেক নামিবে, এখনও গভীরতর পঙ্কস্তূপ অনাবৃত হইতে অবশিষ্ট আছে। প্রদেশ দেশের প্রতিকূল।

ভারত-সাধনার প্রবাহে ভাঁটা পড়িয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্যান্য ভারত-সাধকগণ তো স্মরণীয় হইয়া আছেন, তবে নবগোপাল মিত্রের এ দশা হইল কেন? তার কারণ অন্যান্য ভারত-সাধকগণের মহত্ত্ব সহজাত, বহুতন্ত্রী তাঁহাদের কীর্তি, তাই একটি তন্ত্রী শিথিল হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের বীণা-ধ্বনিতে বিরাম নাই। নবগোপাল মিত্রের বাদ্যযন্ত্র একতারা। সেই একটি তার আজ শিথিল; শিথিল তন্ত্রীর ক্ষীণ ধ্বনি কাহার কাণে আর প্রবেশ করিবে? ভারত-সাধনার বহিরঙ্গ ব্যতীত তিনি আর কিছু জানিতেন না, সে বহিরঙ্গ আজ অনাদৃত; কাজেই তাঁহারও আজ অবহেলা। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঊনবিংশ শতকের স্রষ্টাদের আসনের একান্তে তাঁহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভগিনী নিবেদিতা

যে-ভারতজিজ্ঞাসায় আমরা বাহির হইয়াছি, যে-ভারতজিজ্ঞাসার পথে গত শতাব্দীর মনীষিগণ চালিত হইয়াছিলেন, সেই ধ্যানের ভারতবর্ষের উপলব্ধি বড় সহজ নয়, বড় সহজে হয় নাই। বাস্তব ভারতবর্ষের সান্নিধ্যই ভাব-ভারতবর্ষের উপলব্ধির প্রধান অন্তরায় ছিল। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আকর্ষণ, আর একদিকে ভারতবর্ষের দৈহিক দীনতা। প্রত্যহের তুচ্ছতা আর অতিপরিচিত অবজ্ঞা ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এত সব বাধা সত্ত্বেও কোন কোন মনীষী প্রেমের তৃতীয়নেত্রের দৃষ্টিতে সেই সত্তাকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে তাহাকে অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিয়াছিল, ইহাতো আজ ঐতিহাসিক সত্য।

এহেন সময়ে একজন বিদেশিনী বাহিরের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া, সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া অতিঅনায়াসে সেই ধ্যানমূর্তিকে দর্শন করিলেন। দূরত্বই এ ক্ষেত্রে তাঁহার সহায় হইল, বাস্তবের নমিত ফণার উপরে দণ্ডায়মান ভাবরূপ তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইল।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় না হইয়াও ভারতবর্ষীয় ছিলেন, আনুষ্ঠানিক অর্থে হিন্দু ছিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের সার্থক উপলব্ধির গৌরবে তৎকালীন ভারতজিজ্ঞাসু মনীষিগণের পুরোভাগে আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দীনতার, তুচ্ছতার, দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই, একজন অভিজাতবংশীয় বিদেশী মহিলার চোখে সে সমস্ত আরও অধিক প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রেমের তীব্রতায় নিবেদিতা সেই সব বাধাকে গোড়াতেই অতিক্রম করিয়া গেলেন। অন্য সকলের পক্ষে যাহা দুরতিক্রম্য, নিবেদিতার কাছে তাহার অস্তিত্বমাত্র ছিল না। তিনি উমার ন্যায় শিবের জটার মধ্যে অনন্ত যৌবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

"একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণ সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বি, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মত রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারি মধ্যে আমার সমস্ত মন ভাবৈকরস হইয়া স্থির রহিয়াছে। শিবের মধ্যেই যে-সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন। ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব

দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে সরিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার শিব ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি, নিবেদিতা তপস্বিনী সতী। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মাধ্যমে নিবেদিতা ভারতবর্ষের পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বাগবাজারের বোসপাড়ার ছোট গলিটিতে নিবেদিতা একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার কালেই ১৯১১ সালে দার্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বিদ্যালয় বাড়ীটি কোন ইউরোপীয় মহিলার থাকিবার যোগ্য ছিল না, বিশেষ গ্রীষ্মকালে। মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার পরে সারাদিন তিনি নিজে লেখাপড়ায় ডুবিয়া থাকিতেন, সঙ্কীর্ণ ঘরের চাপা গরমে তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিত। "ঐ সময়ে এক একদিন কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'মাথার বড় কষ্ট। কিন্তু তখনই আবার গিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতেন।"

এই বিদ্যালয়টি এবং এখানকার কাজ নিবেদিতার পক্ষে ভারতোলব্ধির সাধনক্ষেত্র ছিল। পদ্মফুলের চিত্র তাঁহার বড় প্রিয় ছিল, তিনি বলিতেন—"এই ফুল ভারতবর্ষীয় চিত্রকর ভিন্ন অন্য কেহ আঁকিতে জানে না।" নিবেদিতার দৃষ্টিতে পদ্মফুল ভারতের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। আর শুধু পদ্মফুলের ছবিই বা কেন, ভারতের ভাস্কর্য্য ও চিত্র তাঁহার বড় প্রিয় ছিল—কেবল সুন্দর শিল্পবস্তুরূপে নয়, ওই শিল্পের মধ্যে ভারতের আত্মা প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই নিবেদিতার তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—নিবেদিতার প্রেরণায় ও চেষ্টায় নন্দলাল বসু প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পিগণ প্রথমবার অজণ্টায় প্রেরিত হন।

যেমন শিল্পে, তেমনি ইতিহাসে সর্বত্রই নিবেদিতা ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহার চিতোরভ্রমণের কাহিনী বলিবার সময়ে পদ্মিনীর উপাখ্যান স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন—"আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম···অনল কুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষ মূর্তি মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আঃ কি সুন্দর! কি সুন্দর!" "ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্না হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন—ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতে লাগিলেন মা, মা, মা!" তাঁহার ছাত্রীদের মুখে বাঙলাভাষার মধ্যে কোন ইংরাজী শব্দ শুনিলে লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিত। আবার কাহারো মুখে তাহার বাঙলা প্রতিশব্দ শুনিবামাত্র তিনি শিশুর ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। নিবেদিতার জীবনীলেখিকা বলিতেছেন—"শুনিয়াছি, নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত, সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত হইলেন এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বারবার তাহাকে নমস্কার

করিয়া বলিলেন—তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি, তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা এই দৃষ্টান্তকে অতিক্রম করিতে পারে কি? কোন বৈষ্ণবভক্ত বলিয়াছেন যে, যে-লোক প্রভুভক্ত, তিনি তাঁহার দাস। বৈষ্ণবভক্তের আকাঙ্ক্ষার বহির্মূর্তি-রূপিনী কি ভগিনী নিবেদিতা নন?

"অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে একবার মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সর্বদা পাদুকা পরিধান অভ্যাস থাকিলেও তিনি স্কুল বাড়ী হইতে খালি পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন এবং সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই এমন আগ্রহ ও সরল ভক্তির সহিত পূজা কোথায়, পূজা কোথায়—জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই ভাব দেখিয়াই উপস্থিত সকলে যেন সেই মুহূর্তেই পূজার সার্থকতা অনুভব করিলেন।"

এমন যে হইতে পারিয়াছিল তাহার প্রথম কারণ নিবেদিতার উপরে বিবেকানন্দের প্রভাব। বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রদ্ধাপ্রবণ হৃদয়কে ভারতের অনুকূলে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও কারণ আছে—নিবেদিতার চরিত্রের মধ্যেই তাহা নিহিত। নিবেদিতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ভক্তি, কিন্তু এই ভক্তি অসাধারণ নিষ্ঠা ও বীরত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই বহুতর প্রতিকূলতার মধ্যেও ভক্তি তাহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সাধারণ লোকের ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়; তাহাতে নিষ্ঠার ভাব না থাকাতে সে ভক্তি কর্মের ভিতর দিয়া, কঠোরতার ভিতর দিয়া আপনার সার্থকতায় পৌঁছিতে পারে না। নিবেদিতার চরিত্রে নারীসুলভ ভক্তির তলে পুরুষদুর্লভ বীর্য্য ছিল। বিবেকানন্দের বীরত্বের শিখা হইতে নিজের শিখাটি যেন তিনি প্রজ্বলিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীলেখিকা বলিতেছেন—"তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটি কিন্তু আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি—তাঁহার নাম বীরেশ্বর, তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও। বীর কথাটি তিনি সকল সময়েই পূর্বোক্ত প্রকারে জোর দিয়া বলিতেন।" নিবেদিতার আদর্শ রমণী ছিলেন গান্ধারী, যিনি যুদ্ধগমনোদ্যত পুত্রগণকেও যতোধর্ম স্ততোজয়, ছাড়া অন্য আশীর্বাদ করিতেন না। ধর্মের জয়ে পুত্রের পরাজয়ও তাঁহার কাম্য ছিল।

নিবেদিতার চরিত্রের এই দুটি দিককে, ভক্তি ও বীরত্বকে মিলাইয়া না দেখিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা হইবে না। তাঁহার বীরত্বের বাহন ছিল তাঁহার অসাধারণ মনীষা। এই মনীষার গুণে, তিনি অনায়াসে পুরুষগণের সমকক্ষতা করিতেন, অনেক সময়েই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইতেন। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে লোকমাতা বলিয়াছিলেন—তিনি সমানভাবেই লোকনেতাও ছিলেন বটে। তাঁহার চরিত্রের ভক্তি ও বীরত্বের মধ্যে ভারতীয় ভাবের সহিত যেন ইউরোপীয় ভাবের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত—এমন কয়জন ভারতীয়ের হইয়া থাকে। নিবেদিতার তর্কাতীত চারিত্রিক মহত্ত্ব

অবশ্যই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র যে বিচিত্র উপদানে সৃষ্ট হইয়াছিল —তাহার আকর্ষণও অল্প নয়। নিবেদিতা-চরিত্র ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তুজনারই আদরের সামগ্রী। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ধারে নামক স্মৃতিগ্রন্থে নিবেদিতার ছবির তুএকটা টুকরা আছে, সেগুলির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়াই মনে হয়। নিবেদিতা অপরিচিতের উপরে কিভাবে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেন—তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

"প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়ীতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত নেমে গেছে শাদা ঘাগরা, গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা, ঠিক যেন শাদা পাথরের-গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা এক দিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন তুই কেন্দ্র থেকে তুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।"

আবার একটি অভিজাত ধনিকের সান্ধ্যবৈঠকের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন —"সন্ধ্যে হয়ে এলো এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই শাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী-রূপোলীতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে কি বলবো যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেয়েরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবেরা কানাকানি করতে লাগলো। উড্‌রফ ব্লাণ্ট এসে বললেন, কে এ? তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম। সুন্দরী, সুন্দরী, কাকে বলো তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা সেই চন্দ্রমণি-দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"

নিবেদিতার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেতো।"

নিবেদিতার চরিত্রের উপরিতলে চাঁদের আলো কিন্তু সে চাঁদের আলো পড়িয়াছে অটল পাহাড়ের উপরে। বীর্য্যের উপরে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত, ফলে তপস্বিনী মহাশ্বেতার সৃষ্টি করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে গিয়া কথা বলিলে মনে বল পাওয়া যাইত। নিবেদিতা-চরিত্রে লোকমাতা ও লোকনেতার মিলন ঘটিয়াছিল।*

---

*শ্রীসরলাবালা দাসী রচিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের বাঙালীসাধকের অভিজ্ঞতা 'যত পথ তত মতে'র সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় তখনকার সমাজের সম্মুখে পথ ও মতের অন্ত ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের অভাব ছিল না। ধর্মোদ্‌ভ্রান্তির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ধর্মোদ্‌ভ্রান্তির চরম দৃষ্টান্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, কিন্তু বংশগত পথ তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে নাই—তাঁহাকে বহুবার ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম, প্রোটেস্টান্ট খৃষ্টান, রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন করিয়া এক নূতন মতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষের দিকে তিনি নিজেকে বৈদান্তিক খৃষ্টান বা ইণ্ডিয়ান ক্যাথলিক খৃষ্টান বলিতেন। এই সন্ন্যাসীর চিত্তে সমান তীব্রতায় ধর্ম ও দেশের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—রোম্যান ক্যাথলিক বলিলে নিজেকে বিশেষভাবে ভারতীয় বলা হয় না, সেইজন্য খৃষ্টধর্মের এক নূতন পন্থার উদ্ভব তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল—সেই মতবাদেরই তিনি নামকরণ করিয়াছিলেম ইণ্ডিয়ান ক্যাথলিক খৃষ্টান বা বৈদান্তিক খৃষ্টধর্ম। দার্শনিকতত্ত্ব হিসাবে এই মতবাদ কতদূর যুক্তিসহ, সে আলোচনা অনাবশ্যক। ব্রহ্মবান্ধবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই আমাদের লাভ।

তখনকার অবস্থাগতিকে ব্রহ্মবান্ধবকে ব্যবহারিক রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তাঁহার প্রকৃত প্রবণতা কোন দিকে ছিল? ব্রহ্মবান্ধব কি মূলতঃ রাজনীতিক ছিলেন? আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির দিকেই কি তাঁহার মৌলিক প্রেরণা নয়? রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায় গ্রন্থের ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধবের একটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব শেষবার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন যে, 'রবিবাবু, আমার পতন হয়েছে।' কি অর্থে তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন, কি অর্থে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না—কিন্তু মানুষের বিশিষ্ট শক্তির ও সাধনার ক্ষেত্র হইতে অবস্থাচক্রে ক্ষেত্রান্তরে গমন যদি স্বধর্মত্যাগ হয়, তবে হয়তো ব্রহ্মবান্ধবের উক্তি সত্য।

কিন্তু একথা কেবল ব্রহ্মবান্ধবের সম্বন্ধেই মাত্র সত্য নয়—তখনকার অনেক বাঙালী মনীষী সম্বন্ধে ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। আনন্দমোহন বসুর জীবনচরিত পড়িয়া মনে হয়, ধর্মসাধনাই তাঁহার বিধি-নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে অবাধ বিহারের অধিকার তিনি স্বেচ্ছায় বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা পড়িয়া মনে হয় যে, কত বড় সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে আমরা হারাইয়াছি। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মার প্রবাহ সমাজগত ধর্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে বাঙলাসাহিত্যের একটা উষর অংশকে সরস, সুন্দর ও ফুল্ল করিয়া তুলিতে পারিত। তাঁহার কার্য্যান্তব্যাপৃত চিত্ত হইতে যে কয়েকটি ছিটেফোঁটা আসিয়া



উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



রমেশ দত্ত



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়িয়াছে—তাহাতেই বাঙলাসাহিত্যের কয়েকখানি অবিস্মরণীয় গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছে। নরেন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণদেবের সঞ্জীবনস্পর্শ না পাইলে খুব সম্ভবতঃ বিবেকানন্দরূপে দেখা দিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার বাগ্মিতা, সংগঠন-প্রতিভা ও মনীষা যে চাপা থাকিত এমন মনে করিবার কারণ নাই—সে সমস্তই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠিত। স্বামীজী বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে কিভাবে এবং কি আকারে ইহাকে প্রভাবিত করিতেন তাহা একটা কৌতূহলজনক চিন্তনীয় বিষয়। একদিকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন চলিতেছে—আর তিনি যে নিছক মানবতামূলক নরসেবাকার্য্যে লিপ্ত আছেন—এমন তো ভাবিতে পারি না।

আগে একবার বলিয়াছি যে, গত শতাব্দীতে বাঙালীসমাজের আত্মার প্রবাহ প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক সাধনার খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল—বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সেই প্রবাহ ব্যবহারিক রাজনীতির খাতে বহিতেছে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যেও একটা সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। তখনকার বাঙালী বিপ্লবীরা এক হাতে গীতা, অপর হাতে বোমা লইয়া চলাফেরা করিত। মাণিকতলার বাগান কেবল বোমা-তৈয়ারীর আড্ডা মাত্র ছিল না, সেখানে গীতা-পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। স্বদেশীযুগের বিপ্লবতত্ত্ব গীতাশ্রয়ী। গীতা, আনন্দমঠ, অনুশীলন-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া বাঙালী বিপ্লবীরা স্বকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু শতাব্দী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল—ধর্ম ও রাজনীতির এই সমন্বয়ে ততই ফাটল চওড়া হইতে হইতে আজ এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, আজ কোন বিপ্লবী গীতার দোহাই দিলে তাহাকে খুব সম্ভবতঃ সেকেলে অপবাদ দিয়া দল হইতে খেদাইয়া দেওয়া হইবে। এখনকার বিপ্লবীদের এক হাতে ধর্মঘটের আহ্বানলিপি অন্য হাতে অর্থনীতির পুস্তক। বাঙালীসমাজের বিপ্লববাদের ভিত্তির পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঐ পরিবর্তন ঘটে নাই। ব্রহ্মবান্ধবের জীবন সাধনা ও ব্যবহারিক রাজনীতির মধ্যে সমন্বয়ের একটা ধনুর্ভঙ্গপ্রয়াস। এমন যে ঘটিতে পারিয়াছিল তার প্রধান কারণ তিনি মুহূর্তের জন্যও ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার কাছে ভারতের ধর্ম ও ভারতোদ্ধার একার্থক ছিল, তাঁহার কাছে ভারতের গীতা ও ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ একার্থক ছিল।

সেকালের মনীষিগণকে ভারত-আবিষ্কার করিতে গিয়া ভারতোদ্ধার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, যে-ভারতবর্ষকে মানসিক জগতে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, বাস্তব জগতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠাদান মানে ভারতবর্ষকে বিদেশীশাসন হইতে মুক্ত করা। এইভাবে চিন্তাসূত্রকে অনুসরণ করিবার ফলে সকলের অজ্ঞাতসারে গোড়া হইতেই রাজনীতি ও ধর্মনীতি জড়িত হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে যে বিচিত্র সম্পর্ক দৃষ্ট হইয়াছিল পৃথিবীর অন্যদেশে তাহার তুলনা পাওয়া ভার। ব্রহ্মবান্ধবের জীবন ও কীর্তিতে এই সম্বন্ধই পরিদৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মবান্ধবের জন্ম ১৮৬১ সালে, মৃত্যু ১৯০৭ সালে। কলেজের পড়া শেষ হইবার আগেই ভারতোদ্ধার করিবার বাতিক তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি বুঝিলেন ইংরাজ তাড়াইতে হইলে সামরিক শিক্ষা আবশ্যক। সামরিক শিক্ষা পাইবার আশায় অনেক কষ্ট ও বিপদ সহ্য করিয়া তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যে পৌঁছিলেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ইহার পরে যে কয়েকটি বিশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহার স্মৃতি জড়িত প্রত্যেকটিতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে হিন্দুধর্ম প্রচারের আশায় তিনি অক্সফোর্ডে গিয়া বেদান্তসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন। আর শেষে বঙ্গভঙ্গের পরে সন্ধ্যার সম্পাদকরূপে, ব্যবহারিক রাজনীতির অন্যতম কর্ণধাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। সন্ধ্যার সম্পাদকতা করিবার সময়েই রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন, বিচার শেষ হইবার আগেই অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে ভারতবর্ষ তাঁহার চিত্তাকাশের ধ্রুবতারা ছিল তাহার বাণী প্রচার করিবার আশাতেই তিনি অক্সফোর্ডে গিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষের তপোবনের আহ্বানই তাঁহাকে বোলপুরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, নৈবেদ্য কাব্যকে ব্রহ্মবান্ধব যেরূপ অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন তেমন উদার প্রশংসা তাঁহার ভাগ্যে অল্পই মিলিয়াছে। নৈবেদ্যর প্রশংসার কারণ বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়। নৈবেদ্য কাব্যে ভারততত্ত্ব যেমন দিব্য মূর্তিলাভ করিয়াছে—এমন অল্পই দেখা যায়। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার ধ্যানের ভারতবর্ষকে কবির কল্পনার স্ফটিকের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রশংসা না করিয়া পারিবেন কেন? সে প্রশংসা তো কবিবিশেষের উদ্দেশ্যে নয়—সে যে ভারতবর্ষেরই জয়ধ্বনি। আর অবশেষে ধ্যানের ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসনমুক্ত করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এই তো তাঁহার জীবন। আত্মার ক্ষেত্রে বাস্তব সার্থকতার মাপকাঠি অচল। উপলব্ধির সত্যতা ও সমগ্রতার দ্বারা আত্মিক সফলতার বিচার করিতে হইবে। সে বিচারে এই ইণ্ডিয়ান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী তাঁহার ধ্যানের ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। *

* ৭ই মার্চ, ১৯৪৮ সালের রবিবারের যুগান্তরে প্রকাশিত শ্রীপ্রভাত বসুর প্রবন্ধের সাহায্য স্বীকৃত হইল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও সাধনা বাঙালীর মনের একটি গুরুতর পরিবর্তন সূচনা করে। তিনিই প্রথম বাঙালীর রাষ্ট্রসাধনাকে অন্যভাবনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ রাজনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং বলিলে অন্যায় হইবে না যে, গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্ব অবধি বাঙালী রাজনীতিকগণ তাঁহার প্রদর্শিত ধারাকে অনুসরণ করিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। রামমোহনের সাধনায় রাষ্ট্রচৈতন্য ছিল, কিন্তু যেহেতু তাঁহার সমস্ত সাধনারই ভিত্তি ছিল ধর্মসাধনা, তাঁহার রাজনীতিও ধর্মের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে কোন মনীষীর সাধনাকে বিশুদ্ধ রাজনীতির সাধনা বলা চলে না। এমন কি আনন্দমোহন বসু যিনি সুরেন্দ্র নাথের সমসাময়িক ও সহকর্মী তাঁহাকেও বলা চলে না। কর্ম-সাধনায় সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহনের মিল থাকিলেও আসল অমিলটা ছিল গোড়া ঘেঁষিয়া—আনন্দমোহন মূলতঃ আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। পরবর্তীকালের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও এই একই কারণে সুরেন্দ্রনাথের পার্থক্য। সুভাষচন্দ্র মূলতঃ আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাঁহার রাজনীতি বিশুদ্ধ রাজনীতি ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি ছিল ধর্মভাব। সুরেন্দ্রনাথ পূর্বতন রাজনীতির ধারাকে তাহার গভীরতর ভিত্তি হইতে অপসৃত করিয়া এক নূতন প্রতিষ্ঠা দিলেন। এখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য আবার এখানেই তাঁহার দুর্বলতা। গান্ধীজীর একাধিক আন্দোলন আপাত-দৃষ্টিতে ব্যর্থ হইলেও তাঁহার প্রভাব যে কমে নাই, তাহার কারণ গান্ধীজীর মূল প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যত্র—গভীর অধ্যাত্মবাদের উপরে। সুরেন্দ্রনাথের সেরূপ কোন গভীর ভিত্তি না থাকায় যখনই তাঁহার বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন চরিতার্থতা লাভ করিল—দেশ হইতে তাঁহার প্রভাব যেন একেবারে লোপ পাইল। কেন এমন হইল ভাবিবার বিষয়। স্বদেশী-আন্দোলনের যিনি মুকুটহীন একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন, ভাঙা-বাঙলা জোড়া লাগিবার পরে লোকে তাহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল কেন? দেশের মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্তন, গান্ধীজীর আবির্ভাব—এইসব ঘটনার দ্বারা ইহার আংশিক ব্যাখ্যা চলে, কিন্তু পুরা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আসল ব্যাখ্যাটা এই যে, সুরেন্দ্রনাথের তূণে একাঘ্নী অস্ত্র মাত্র ছিল। একবার মাত্র সার্থকতা লাভ তাঁহার অদৃষ্টে লিখিত ছিল। দ্বিতীয় সার্থকতার জন্য দ্বিতীয় ভিত্তির আবশ্যক—তাঁহার জীবনে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ভিত্তি ব্যতীত দ্বিতীয় ভিত্তি বলিয়া কিছু ছিল না। যখন সেই একমাত্র ভিত্তি অপসারিত হইল—সুরেন্দ্রনাথ আর দাঁড়াইবার স্থান পাইলেন না—লোকচিত্ত হইতে তাঁহার অপসৃতি ঘটিল। আর কোন ভাবেই তাঁহার অপসারণের ব্যাখ্যা করা চলে না। বলা চলে যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিকে ইউরোপীয় রাজনীতির ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য ম্যাটসিনি তাঁহার রাজনীতির গুরু ছিলেন। ম্যাটসিনির ব্যক্তিগত

ধর্মজীবন ছিল—কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনির ইটালীয় ঐক্যসাধনাকে যেমন গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্য ভাবকে তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই। ম্যাটসিনির আদর্শবাদের প্রশংসা সর্বদাই তিনি করিতেন—কিন্তু সে আদর্শবাদ স্বার্থগন্ধহীন রাজনৈতিক সাধনার আদর্শবাদ। সুরেন্দ্রনাথ এই নূতন সাধনার অস্ত্রস্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া লইয়াছিলেন। সেটি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা।

সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের সহিত অন্যান্য বাঙালী মনীষীদের মূল প্রভেদটা কোথায় এতক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—এবারে তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যটা দেখিবার চেষ্টা করা যাক। আমরা বারবার বলিয়াছি যে, উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য সমস্ত বাঙালী মনীষী ভারতসাধনায়, ভারত-আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যসাধন তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। এ দিক দিয়া বিচার করিলে সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের দলভুক্ত বলিয়াই ধরিতে হইবে। যদিচ ভারত-সভার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ এবং একমাত্রতঃ রাজনৈতিক ছিল—কিন্তু সে রাজনৈতিক সাধনার লক্ষ্য ভারতবর্ষ। ভারত-সভা নামটির মধ্যেই এই আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সভা স্থাপন করিবার সময়ে কেহ কেহ বঙ্গ-সভা বা বেঙ্গল এসোসিয়েশন নামকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের তাহা পছন্দ হয় নাই। তিনি বলিতেছেন—"আমাদের মনে হইল যে এরূপ নামে, কিম্বা এই জাতীয় নামে আমাদের কর্মের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। কারণ তখনই ম্যাটসিনির আদর্শের প্রভাবে অখণ্ড ভারতের আদর্শ, সমস্ত ভারতবর্ষকে একই রাজনৈতিক সাধনার পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত করিবার আদর্শ বাঙলাদেশের ভারতীয় নেতাদের মনকে পাইয়া বসিয়াছিল। কাজেই আমরা ভারত-সভা নামকরণের সঙ্কল্প করিলাম।" যেসব উদ্দেশ্য লইয়া ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে—ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজ ও সম্প্রদায়কে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সাধনার বন্ধনে সংহত করিয়া একীকরণ। পূর্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথের এই আদর্শবাদের পশ্চাতে ম্যাটসিনির দৃষ্টান্ত ছিল। তিনি বলিতেছেন যে, ম্যাটসিনি ইটালীয় ঐক্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা ভারতীয় ঐক্য চাহিতেছিলাম। ম্যাটসিনির প্রভাব তরুণসমাজে সক্রিয় ছিল।

ভারতের ঐক্যসাধনই সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল। তাহার একটি প্রমাণ পাইলাম, ভারত-সভা-প্রতিষ্ঠায় ও তাহার আদর্শপ্রচারে। আর একটি প্রমাণ তাঁহার ভারতব্যাপী প্রচারমূলক ভ্রমণে। এই সময়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া উনিশ বৎসর করিবার প্রস্তাব বিলাতে হইয়াছিল। ভারতীয় নেতাগণ বুঝিয়াছিলেন, ইহার আসল উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ওই চাকুরিতে ভারতীয় যুবকগণের প্রবেশপথের সঙ্কীর্ণতা-সাধন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলিকাতায় একটি সভা হয় এবং এ বিষয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে সজাগ করিবার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালে ভারতব্যাপী প্রচারকার্যে বাহির হন। অল্প-দিনের মধ্যে তিনি উত্তর ভারত এবং পরে দক্ষিণ ভারতের প্রধান সহরগুলি ভ্রমণ করিয়া আসেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফল যাহাই হোক—পরোক্ষ ফলটাই আসল। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতায়,

তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শবাদে সমস্ত প্রদেশগুলি অখণ্ড ঐক্যের ভাব অনুভব করিয়া একটি রাজনৈতিক সত্তার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বলা যাইতে পারে যে, ইহাই সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান ফল—তাঁহার প্রধান দান। রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত সমস্ত মনীষী যে ঐক্যবোধের সাধনা করিতেছিলেন, ভিন্ন পন্থায় সেই লক্ষ্যেই সুরেন্দ্রনাথও যাত্রা করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি রামমোহন, কেশবচন্দ্রের মতো সুগভীর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে অধিকতর কার্য্যকরী ছিল, অধিকতর আশুফলপ্রসূ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন প্রভৃতি চিরন্তনের বার্তা বলিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন অদ্যতনের বার্তা। প্রয়োজনের মাপকাঠিতে অদ্যতন চিরন্তনের চেয়ে ন্যূন নয়। অসংখ্য অদ্যতনেরই মালা চিরন্তন।

ইতিহাসের রহস্য এই যে, তাহার এক একটি দিবস একভাবে দেখা দিয়া অপ্রত্যাশিত-ভাবে শেষ হয়। অনেক সময়ে উষা দেখিয়া সন্ধ্যার কল্পনা করা যায় না—প্রহরগুলির বিবর্তন অভাবিত পথ ধরে। সুরেন্দ্রনাথের জীবন ইহার একটি উদাহরণ। ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য-সাধনের সঙ্কল্পে যাঁহার জীবনের আরব্ধি, উগ্র প্রাদেশিক সত্তার সূচনায় তাহার সমাধান। অবশ্যই ইহা স্বেচ্ছাকৃত নয়—তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য এবং মর্মান্তিকভাবে সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের চরম সাফল্যের ক্ষণ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন। এই আন্দোলনের তিনিই রাজনৈতিক নায়ক, প্রধানতঃ, তাঁহারই প্রচেষ্টায় বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ভাঙা-বাঙলা জোড়া লাগিল বটে, কিন্তু ভারতীয় ঐক্যে ফাটল দেখা দিল। তখনকার দিনে ফাটলটা অতিশয় সূক্ষ্ম ছিল, কাহারো চোখে পড়ে নাই—কিন্তু কালক্রমে সেইসব ফাটল প্রদেশান্তরের সীমানায় সীমানায় মুখ-ব্যাদান করিয়া ভারতীয় ঐক্যকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের পূর্বে "বঙ্গ" শব্দটা শোনা যায় নাই, আন্দোলনের কয়েক বৎসর "বঙ্গ" শব্দটার উপরে এত ঝোঁক পড়িল যে, জনগণের চিত্তে "বঙ্গ" বোধটা ভারতবোধকে ছাপাইয়া উঠিল এবং তাহারই দৃষ্টান্তে ও প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যেক প্রদেশ আপন আপন প্রাদেশিক মেরুদণ্ডের উপরে ভর দিয়া খাড়া হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই প্রতিক্রিয়াকে প্রবলতর করিয়া দিল ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন বিধানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এখন প্রাদেশিকতাবোধ এমন অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের চোখেই ভারতবোধ ব্যাপারটা একটা অনায়ত্ত আদর্শবাদের মরীচিকা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বনস্পতির আড়ালে বন মিলাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে?

অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইবার সংবাদ আসিল। জনতা বেঙ্গলী পত্রিকার অফিসে আসিয়া রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে একখানা গাড়িতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া গোলদীঘির দিকে চলিল। এবারে সুরেন্দ্রনাথের ভাষাতেই শোনা যাক্। "সেখানে উপস্থিত হইয়া বিষম উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিলাম। তখনো আলো জ্বলে নাই, সব অন্ধকার, আমরা কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, সকলে উল্লাসে চীৎকার করিতেছিল, কেহ কেহ

প্রশ্ন করিতেছিল। একটি কণ্ঠস্বর শুধাইল—দিল্লীতে রাজধানী সরাইবার বিষয়ে আপনার মত কি? আমি বলিয়া উঠিলাম, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, আমার আকস্মিক জবাব মূলতঃ সত্য।"

সত্যই কি প্রমাণ হইয়াছে? পরবর্তীর পরেও যে পরবর্তী আছে। সেই অতিপরবর্তীর সাক্ষ্য কি এই যে, কলিকাতা হইতে রাজধানীর অপসারণে বাঙলাদেশের কোনই ক্ষতি হয় নাই? ভাঙা-বাঙলা জোড়া লাগিল এবং কলিকাতার রাজধানী দিল্লী গেল—এক বৃন্তে যুগল ফল। জোড়া বাঙলাকে আবার আমরা ভাঙিলাম। কিন্তু কলিকাতাকে আর রাজধানী করিতে পারিলাম কি? বাঙালী চাকুরির বাজারে পিছাইয়া পড়িতেছে বলিয়া লোকে যে অভিযোগ করে—তাহার একটা কারণ রাজধানীর অপসারণ। প্রদেশে রাজধানী থাকিলে প্রদেশের পক্ষে চাকুরির পথ স্বভাবতঃই কিছু প্রশস্ত হয়। রাজধানী-অপসারণের এটি গৌণ কুফল। কিন্তু আসল কুফল এই যে, কলিকাতা পূর্বে ছিল ভারতের নাভিকেন্দ্র, সর্বভারতীয় পথিকের আনাগোনায় কলিকাতা ছিল ভারতীয়তাবোধের কাশীধাম। রাজধানী অন্যত্র যাইবামাত্র কলিকাতা হইয়া উঠিল প্রাদেশিকতার কামাখ্যা, প্রাদেশিকতার মোহিনী মানুষকে ভেড়া বানাইবার কুহক জানে। বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনকে ন্যূন করা আমার অভিপ্রায় নয়—তাহার পরিণামটাকেই কেবল পরিপাক করিতে পারিতেছি না। ভাঙাবাঙলা যদি জোড়া না লাগিত, তাহাতে হয়তো ক্ষতি ছিল—কিন্তু সে ক্ষতির পূরণ করিত কলিকাতায় রাজধানী থাকিলে। তাহা হইলে ভারত-বোধের বাহিনীর পুরোভাগে থাকিতে বাঙলাদেশ এবং তাহার নেতৃত্বে সমস্তগুলি প্রদেশ হয়তো এককালে ভারততীর্থে পৌঁছিতে পারিত। ইহাতে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি। কিন্তু এখন আমরা কোথায় চলিয়াছি! ভাবিতেই শরীর শিহরিয়া ওঠে। সংসারে চিন্তা করিবার শক্তি যাহার নাই, বোধকরি একমাত্র সে-ই সুখী।

রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশ দত্তর জন্মের পরে আজ ঠিক একশত বৎসর অতিবাহিত হইল। এই শত বৎসর-কালে বাঙালীসমাজের কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে যুগ ছিল ইংরাজিশিক্ষার আদি যুগ—এখন ইরাজিশিক্ষার পরিবর্তনের কথা উঠিয়াছে, সেদিনকার বাঙলাসাহিত্য বাসুদেব-চরিতের শিশু শয্যাত্যাগ করিয়া আজ প্রাপ্তযৌবন, ব্রাহ্মসমাজের সে প্রচণ্ড গতির অবসান, তখনো বৃটিশরাজের পূর্ণমূর্তি দেখা দেয় নাই—এখন বৃটিশরাজ অপসৃত। এই শতাব্দীকালের পরিপ্রেক্ষিতে কত বৃহৎ ছোট হইয়া আসিয়াছে, আবার কত ছোট বর্দ্ধিতায়তন। তখনকার কত বিশ্রুত আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। এই উলট-পালটের সময়ে রমেশ দত্তর প্রতিষ্ঠারও কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় দলের বাঙালী সিভিলিয়ান, প্রথম ভারতীয় কমিশনার, ইংরাজি সুলেখক, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক, উপন্যাসস্রষ্টা, অপ্রমত্তবুদ্ধি রমেশ দত্তর গৌরব আজ ম্লান। তৎকালে কবি যাঁহাকে দেশবন্ধু, লোকবন্ধু, জনবন্ধু অভিহিত করিয়াছিলেন সাহিত্যিক ও নাগরিকগণের সভা যাঁহাকে একাধিকবার সম্বর্দ্ধিত করিয়া কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছিল, আজ তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর তারিখটাও লোকস্মৃতি হইতে অবলুপ্ত। দেশের অর্থনীতিক ও ঐতিহাসিকগণ রমেশ দত্তর কীর্তি-কথা কিছু স্মরণ রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেকালের জনবন্ধুকে একালের জনসাধারণ একেবারেই ভুলিয়াছে। পাঠক সাধারণেও তাঁহার উপন্যাস আর পড়ে না। কোন প্রকাশক তাঁহার উপন্যাসগুলি মুদ্রিত করিবার কল্পনা করে না, অথচ তাঁহার উপন্যাসগুলি এখনো সুখপাঠ্য।

রমেশ দত্ত ১৮৭৮ সালের ১৩ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ সালে বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সিভিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার আশায় ইংলণ্ড যাত্রা করিয়া ১৮৭১ সালে দেশে ফিরিয়া চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে তিনি বরোদা রাজ্যের রাজস্ব-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে তিনি উক্ত রাজ্যের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—এই পদে থাকিবার সময়েই ১৯০৯ সালের ৩০শে নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহাই তাঁহার কর্মজীবনের কাঠামো। কিন্তু এই কাঠামো হইতে মানুষটিকে জানিবার অল্পই সম্ভাবনা, কারণ কর্মীকেই কর্মে জানা যায়, কিন্তু রমেশ দত্তর কর্মজীবন সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, বিচিত্র কর্মগৌরবে তাঁহার জীবন গঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রধানতঃ কর্মীপুরুষ ছিলেন না। রমেশ দত্ত চিন্তাশীল ভাবুকপুরুষ ছিলেন, কর্ম তাঁহার জীবনের বহিরঙ্গ মাত্র। এবিষয়ে সহকর্মী ও বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার মূলগত ভেদ ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কর্মীপুরুষ। বরঞ্চ এ বিষয়ে জন মর্লির সহিত রমেশ দত্তর মিল দেখিতে পাই। দুজনেই ভাবুক, চিন্তাশীল, পণ্ডিত এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক,

কিন্তু ঘটনাস্রোতের টানে দুজনেই রাজনীতিক্ষেত্রে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বভাব ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রের প্রতিকূলতার ফলে রমেশ দত্তর জীবনে একটি বিষাদের ভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন একটা কারণ ধরিয়া না লইলে বাহিরের দিক হইতে গৌরবমণ্ডিত জীবনের মধ্যে নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস সঞ্চারিত হইবার আর কারণ কি থাকিতে পারে!

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা উপন্যাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রে রমেশচন্দ্র বলিতেছেন—"এই সংসারস্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে, প্রবাসে, জীবনের অনন্ত চেষ্টাপরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম, অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তিলাভ করি। জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই, ধন, মান, খ্যাতি ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই। এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত।"

উদ্ধৃত অংশে যে বিষাদ, ধন, মান, খ্যাতিলাভের প্রচেষ্টার প্রতি যে ধিক্কার, সাংসারিক সফলতার ব্যর্থতাব যে সুর ধ্বনিত, তাহা রমেশচন্দ্রের জীবনের একটা সাময়িক বা গতানুগতিক ব্যাপার নয়। সংসার ও সমাজ উপন্যাসদ্বয়ে এই সুরই দীর্ঘতানে ধ্বনিত হইতেছে। এই অন্তর্নিহিত বিষাদের ফলে তাঁহার কর্মজীবন যুধিষ্ঠিরের রথের মতো কিয়ৎ পরিমাণে মাটি হইতে বিবিক্ত ছিল। লোকে তাঁহাকে কর্মী না মনে করিয়া স্বপ্নালু মনে করিত। রমেশচন্দ্র তাহা জানিতেন। বরোদা রাজ্যের উন্নতিবিষয়ে তাঁহার পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন :—

"Dreams! Dreams! Some will exclaim. Well, let them be so, it is better to dream of work and progress than to wake to inaction and stagnation. This last shall never be my vocation, it is not in my nature."

স্বপ্নও সহজ, কর্মও সহজ, কিন্তু কর্মের স্বপ্ন ও স্বপ্নের কর্মের ন্যায় কঠিন আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কারণ শেষোক্ত দুই প্রক্রিয়ায় মানুষের নিজের মধ্যে একটা দ্বিধা ঘটিয়া যায়, এই দ্বিধা কিছুতেই ঘুচিতে চায় না, এই দ্বিধার ফলে মানুষের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলে, তাহার অশান্তি আর দূব হইতে চাহে না। রমেশচন্দ্রের জীবনে দ্বিধাজাত একটি অশান্তি ছিল।

দ্বিধা তাঁহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে। একবার দেখিলাম ভাবুক পুরুষ কর্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর একবার দেখিতে পাইব তাঁহার ভাবজীবন ও কর্মজীবনের প্রতিষ্ঠাও ভিন্ন। তাঁহার কর্মজীবন সিভিল সার্ভিসের 'স্টীল ফ্রেমের' সহিত আবদ্ধ ছিল—কিন্তু ভাবজীবন দূরদেশে

ও দূরকালে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। কর্মী রমেশ দত্ত বর্তমান কালে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন, ভাবুক রমেশ দত্ত 'সংসার' ও 'সমাজের' পল্লী বাঙলা অতিক্রম করিয়া রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের মধ্যযুগ ভেদ করিয়া ভারতবর্ষের পৌরাণিক কালে ও বৈদিক কালে গিয়া পৌছিয়াছিলেন। তাঁহার মনীষা ও সহানুভূতি কেবল বর্তমান ভারতবর্ষকে লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই—ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বাঙলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে প্রধানতঃ জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতকেই যে বুঝায় তাহার প্রধান কারণ রমেশ দত্তর মতো ইতিহাসের মর্মজ্ঞ পুরুষ বাঙলাসাহিত্যে বিরল। তাঁহার নিজের স্বীকৃতি অনুসারে স্কট তাঁহার গুরু। স্কটের জীবনেও দ্বিধাজাত একটা অশান্তি ছিল। সে অশান্তি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা না দিলেও রোমান্সের কুহকে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই কুহেলিকার মাঝে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল—মধ্যযুগ হাতের কাছেই। তিনি Abbotsford Castle গড়িতে লাগিয়াছিলেন—তাই ভারি পাথরে গড়া হইয়াও স্কটের castle ছিল হাওয়াই কেল্লা।

রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রকৃতির নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে তিনি আত্মনিয়োগ করিবার পূরা সুযোগ পান নাই। তাঁহার সমস্ত কর্ম ও সমস্ত রচনা খণ্ডিত শক্তির ফল। তাঁহার ব্যক্তিত্বও খণ্ডিত। তাই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া আশা তৃপ্ত হয় না, মনে হয় লেখক আরও দিতে পারিতেন, কর্মের নিকাশ লইতে গেলে মনে হয় তিনি আরও করিতে পারিতেন। এই কারণেই তাঁহার জীবনের সাকুল্য হিসাব মিটিতে চায় না; বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হাতে প্রচুর থাকা সত্ত্বেও হিসাবে ঘাটতি পড়িতেছে—উদ্বৃত্তের ঘরে থাকিতেছে অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা। জমা ও খরচে মাঝে মাঝে কেন এমন হেরফের ঘটিয়া যায়, তাহা একমাত্র চরম জমানবিশ ছাড়া আর কে বলিতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষপঞ্জীজাতীয় যে-কোন গ্রন্থ খুলিলেই প্রথম সিভিলিয়ান হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেখিতে পাওয়া যাইবে। সিভিলিয়ানতন্ত্রের দোষগুণ যাহাই হৌক, ভারতের রাজনীতি ও সমাজে তাহার প্রভাব অপরিমেয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশী সিভিলিয়ানগণের প্রথম—আমাদের জীবনকালে এই ধারার পর্য্যাবসান আমরা লক্ষ্য করিতেছি। আর কোন কারণে না হইলেও প্রথমতম দেশী সিভিলিয়ান বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভারতবর্ষের একটা অধ্যায়ে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আর শুধু যে বিগত বৃটিশশাসনের শুষ্ক দলিলপত্রেই তাঁহার নাম মাঝে মাঝে মর্মরিত হইবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই—তৎকালীন বাঙলাদেশের কবিশ্রেষ্ঠ, সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্বে উল্লসিত হইয়া একটি সনেট লিখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

"সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পূণ্যবলে
ফিরিলা কানন বাসে ; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরে এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী।"

কৃতী পুরুষের দেশে প্রত্যাবর্তনের পথ নির্বিঘ্ন হোক কামনা করিয়া কবি বলিতেছেন,

"যাও দ্রুতে, তরী,
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে।
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্বাদ করে!"

মধুসূদন তখন ইউরোপে প্রবাস-যাপন করিতেছিলেন, তিনিও এক ব্রতসাধনের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, সে ব্রতের পথ ক্রমেই দুরারোহ হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই ফিরিবার পথও দুস্তরতর হইতেছিল, সত্যেন্দ্রনাথের মতো কৃতিত্ব লাভ করিয়া বঙ্গভূমিতে ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলেও সিদ্ধি প্রতি মুহূর্তে দূরাপহত হইতেছিল। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলে সনেটটির পরপক্ষ-তাৎপর্য্য ছাড়াও আত্মপক্ষ-তাৎপর্য্য প্রকট হইতে বিলম্ব হইবে না।

কিন্তু এসব বাহ্য ঘটনা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় হইবার যোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ আছে—কিন্তু সাহিত্যিক ক্ষমতা তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা নয়। তাঁহার বিশেষ শক্তি সমাজসংস্কারে এবং নিখিল ভারতীয়ত্ববোধে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বিলাত-প্রবাস ও বোম্বাই-প্রবাস—এই দুই প্রবাসের অভিজ্ঞতা তাঁহার সমাজসংস্কারস্পৃহাকে, ভারতের গুণগাথাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতরচনার স্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ

করিয়াছে। কাজেই বলা যাইতে পারে, তাঁহার সিভিলিয়ানী চাকুরি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উদ্বোধন করিতে সাহায্য করিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের চাকুরি প্রবেশকালে বাঙালী মহিলাসমাজ সত্যসত্যই অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন; একালে বাস করিয়া সেকালের অন্তঃপুরের অবরোধ কল্পনা করাও সহজ নয়। মহিলাগণ অন্তঃপুরনিবাসিনী ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও বাহিরের জগতের যোগ্য ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রদেশে যাইতেছেন, পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন কিনা? তখন স্বামীর চাকুরিস্থলে পত্নীর যাইবার রেওয়াজ ছিল না। আর যদি তিনি পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যান, তবে তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে? এই দুটি সমস্যা এখন আর সমস্যাই নয়; এখন আমাদের হাসি পায়, কিন্তু তখন সত্যেন্দ্রনাথকে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে এসেছি, বোম্বাই আমার কর্মস্থান নিয়োজিত হয়েছে, বোম্বাই যেতেই হবে, তবে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তখন আবার কলকাতা ও বোম্বাইয়ের রেলপথ প্রস্তুত হয়নি, জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামশায় তাতে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। আমি প্রস্তাব করলুম, বাড়ি থেকেই গাড়িতে ওঠা যাক। কিন্তু বাবা মশায় তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, মেয়েদের পাল্কি চড়ে যাবার নিয়ম আছে, তাই রক্ষা হোক। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ কর্মচারীদের চোখের সামনে দিয়ে বাহির দেউড়ি ডিঙিয়ে গাড়িতে উঠবেন, এ তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হল না। এই তো গেল পর্দা-ভাঙার প্রথম অবস্থা। আমি প্রথম বার বোম্বাই থেকে বাড়ি এসে আমার স্ত্রীকে গভর্নমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী, সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি তো ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এ সব কথা গল্পের মতোই মনে হয়।" পারসী ও মারাঠী মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে কিছু কিছু লইয়া বাঙালী অন্তঃপুরবাসিনীদের বাহিরের জগতে যাইবার মতো পোযাকের সমস্যার সমাধান তিনি করিলেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টাকে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনের সূত্রপাত মনে করা উচিত হইবে না—ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মাত্র। একটি আন্দোলনের মূলে বহু ইচ্ছার যে ব্যাপক সমন্বয় থাকে, ইহাতে তাহা নাই। ইহাকে স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলনের স্বপক্ষে একটি শুভ দৃষ্টান্ত বলিয়াই গণ্য করা উচিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রয়াসের মূল্য কম নয়। তিনিই অন্তঃপুরের নিরর্থক কঠিন প্রাচীরটার উপরে প্রথম আঘাত হানিয়াছিলেন, দেয়াল তাহাতে ভাঙিয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুঃসাহসিক দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া পরবর্তীকালের দেয়াল-ভাঙার দল অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি কীর্তি নিখিল ভারতীয়ত্ববোধসূচক জাতীয় সঙ্গীত-রচনা। তাঁহাকে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলনের কর্তা না বলিয়াও অনায়াসে উক্ত

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তেমনি তাঁহাকে নিখিল ভারতীয়তাবোধের স্রষ্টা না বলিয়াও উক্ত ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করা যাইতে পারে। তখন হাওয়াটাই বহিতেছিল নিখিল ভারতীয়ত্ববোধের। সত্যেন্দ্রনাথ সেই হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়াছেন। প্রধানতঃ নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে স্বদেশী-মেলা বা হিন্দু-মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা—

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতেরি যশোগান।"

এই সঙ্গীতটির কাব্যকলা যেমনি হোক—লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটি। সেকালের প্রথম দেশাত্মক সঙ্গীত কি এবং তাহার লেখক কে জানি না—কিন্তু এ সব তথ্য না জানিয়াও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, তাহার প্রেরণা নিখিল ভারতীয়ত্ববোধ। সাহিত্য বা সঙ্গীত সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নয় একথা আগেই বলিয়াছি—তবু যে তিনি সঙ্গীতরচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, হাওয়া তখন এমনি প্রবল ছিল যে, অব্যাপারীর প্রাণেও উন্মাদনা জাগাইয়া দিত।

ইংরাজিসভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ভারতের পুনর্জাগরণের কালে ভারতবর্ষ নিখিল ভারতীয়তা-বোধের মধ্যেই জাগিয়া উঠিল—তার কারণ কি এই নয় যে, সে নিখিল ভারতীয়তার পালঙ্কের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আবার এই বিরাট চৈতন্যের সূত্রপাত বাঙলাদেশে, যে প্রদেশে ভারতচৈতন্যের সূত্রগুলি তেমন সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় নয়। তৎসত্ত্বেও যখন দেখি যে বাঙলাদেশেই এই ভাবটির নবজাগরণ ঘটিল তখন বুঝিতে হইবে মূল ভাবটির প্রেরণা কি দুর্জয়, শিকড় কি সুগভীরে প্রবিষ্ট। যে আমলের কথা বলিতেছি, তখনকার সকল জাতীয় সঙ্গীতই 'ভারত সঙ্গীত', তখনকার সকল উদ্যমের মূলই 'ভারতপ্রেরণা', তখনকার সকলেই দেশ বলিতে ভারতবর্ষকে বুঝিত। সোনার বাঙলার স্বর্ণমৃগ তখনো আমাদের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে আরম্ভ করে নাই। বস্তুতঃ যে ডেপুটি সাহিত্যিকের দল সোনার বাঙলার রূপকথাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনো তাঁহারা পাঠশালায় বা মাতৃগর্ভে। এককালে যে পূর্ণায়ত ভারতচৈতন্যের মধ্যে আমরা জাগিয়া উঠিয়াছিলাম, সে চৈতন্য কি ভাবে শতাব্দীর দশকে দশকে ভাঙিয়া পড়িল, ভারতচৈতন্যের স্থলে কি ভাবে প্রদেশচৈতন্য আসিয়া প্রবেশ করিল, উদার ভারতীয় নাগরিক হইতে কেমন করিয়া আমরা ধীরে ধীরে প্রাদেশিক বাঙালী হইয়া গেলাম—এ আলোচনা যেমন সময়োপযোগী, তেমনি চিত্তাকর্ষক। বস্তুতঃ বর্তমান পর্য্যায়ের চিত্র-চরিত্রগুলি এই তত্ত্বান্বেষণের একটা চেষ্টা বই আর কিছুই নয়। কেন এমন হইল ? বাঙালী এক সময়ে ভারত-ব্যাপী অস্তিত্ব অনুভব করিত, সহসা সে এমন সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল কেন ? কারণ অবশ্যই আছে —বিনা কারণে কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে ? কতকগুলি কারণ বাহ্য, কতকগুলি কারণ আন্তর। কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানীর স্থানান্তর কি অন্যতম বাহ্য কারণ? বঙ্গভঙ্গের

প্রতিকারকল্পী স্বদেশী-আন্দোলন কি অন্যতম বাহ্য কারণ? এ দুটি যে প্রধান কারণ সন্দেহ নাই, আর এই দুটি কারণের ধাক্কায় ছোটখাটো আরও অনেক কারণ দেখা দিয়াছে, এখনো দিতেছে, সঙ্কীর্ণতর হইবার প্রক্রিয়া এখনো বাঙলাদেশে পূর্ণোদ্যমশীল।

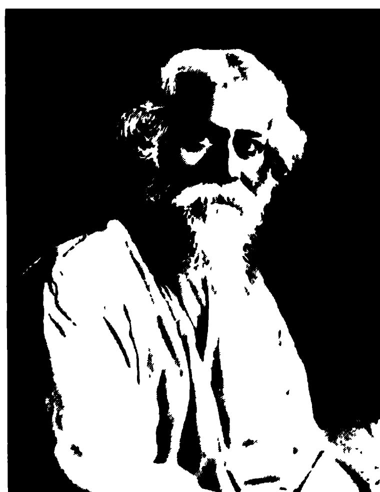
সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তৎকালীন মূল ভাবধারার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মূল ভাবধারার সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। পারিবারিক আবহাওয়ার সহিত তাঁহার বিলাত-প্রবাস ও বোম্বাই-প্রবাসের উদার অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ রাখিলে এমন যে হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তিনি প্রবাসে থাকিয়াও প্রবাসী বাঙালী হইয়া থাকেন নাই, নিজের কর্মসূত্রের দ্বারা তিনি বাঙলাদেশকে ভারতের অপর একটি প্রদেশের সহিত যুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এমন কথা কয়জন প্রবাসী বাঙালীসম্বন্ধে প্রযোজ্য?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যকে বঙ্গসাহিত্যপ্রবাহের মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই কাব্যখানির সহিত বাঙলাসাহিত্যের অন্যান্য কাব্যের যোগ একান্ত শিথিল, ইহা আপন স্বকীয়তায় ও স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। এই বর্ণনা স্বপ্ন-প্রয়াণের কবিসম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সহিত সমকালীন কোন ব্যক্তির মিল নাই—তখনকার দিনে বাঙালীজীবন যে অনিবার্য্য দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিল, তিনি তাহার কোন টানে বিচলিত হইবার লক্ষণ দেখান নাই। একদিকে ডিরোজিওর ছাত্রগণের অতিসাহেবীপনা, অপর দিকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখের অতি রক্ষণশীলতা, একদিকে প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণের দুর্দামতা, অপর দিকে শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রেণীর আর্য্যামি—কোন টানেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে হেলাইতে পারে নাই। এই অবিচলিত আত্ম-প্রতিষ্ঠাভাব তাঁহার চরিত্রে ও কাব্যে সমান প্রকট। তিনি পয়ারও লেখেন নাই, অমিত্রাক্ষরও লেখেন নাই—স্বপ্ন-প্রয়াণের ছন্দ তাঁহার নিজস্ব। মাইকেলের ন্যায় বিদেশী কবির কাব্য হইতে তাঁহাকে নরকবর্ণনা অনুকরণ করিতে হয় নাই—অথচ স্বপ্ন-প্রয়াণে বীভৎস রসের চরম আছে। দেশের চিত্তলোকে অবচেতনভাবে যে বিচিত্র রসস্রোত আছে, তাহাতেই তাঁহার গণ্ডূষ পূর্ণ হইয়াছিল এবং দেশী ছন্দকেই তিনি তাঁহার বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। ছড়ারচনায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কোন প্রকার গোঁড়ামি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, না দেশী না বিদেশী—অথচ ঘরে-বাহিরে দুই প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব তখন মোটেই ছিল না

গোঁড়ামির অপর নাম সংস্কার। কোন সংস্কার তাঁহার ছিল না বলিয়াই তিনি অনায়াসে স্বদেশকে, স্বকীয় সংস্কৃতিকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—ব্রেজিল পাথরের চশমার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। হিন্দু-মেলার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হিন্দু-মেলাসম্বন্ধে তিনি স্মৃতিস্বরূপে বলিতেছেন—"আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাকপরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দুচক্ষের বালাই। এইজন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে। স্ত্রীস্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না, কিন্তু আমার বরাবর ভয় হয়, পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গোড়া থেকে সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি, ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি। ···বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না। দেখ, এক রকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotismএর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন Patriot, আমিও সেই রকম Patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের


স্বামী বিবেকানন্দ


রবীন্দ্রনাথ


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত Patriot হইব কেন? আমি আমার মত Patriot হইতে না পারিলে কি হইল?"

দ্বিজেন্দ্রনাথ দেশ বলিতে ভারতবর্ষ বুঝিতেন, দেশী ভাব বলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি বুঝিতেন—অন্য কোন ক্ষুদ্রতর প্রাদেশিক সত্তার বোধ তাঁহার মনে ছিল না। হিন্দু-মেলা বা চৈত্র-মেলার উদ্দেশ্য ছিল সকলের মনে ভারতবোধের উদ্দীপনা। হিন্দু-মেলা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা করিলেন—"মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।" এই ভারতবোধ বলিতে তিনি কি বুঝিতেন "ভারতী" পত্রিকার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে তিনি বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,—"ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।...... যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহাদের মনে করা মাত্রই সার। পাদরি সাহেবরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙালীর মতো বাঙলা লিখি এবং ইঙ্গ-বঙ্গেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মতো ইংরাজি লিখি তবে তাঁহাদের সে সুখ-স্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাই না।......ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে ভারত ও ভারতীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গোঁড়ামি নহে, ইহা যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে—সংস্কার নহে। তিনি বলেন,—"বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন ও ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে-জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময়ে আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাতবশে যে আমরা এরূপ করি তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি, কিন্তু ভাব তাহার গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জন সম্ভবে না।"

এই উক্তি ও ব্যাখ্যার মধ্যে গোঁড়ামির স্থান নাই। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে আর্য্য ও আর্য্যামির প্রভেদ তিনি বুঝাইতেছেন—"আর্য্যের উপর আপনারও শ্রদ্ধা যেরূপ, আমারও সেইরূপ, কিন্তু আর্য্যামিকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারি না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত আর্য্যতা এবং আর্য্যামির মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সেই সম্বন্ধে লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া, ridiculousness of আর্য্যামি দেখাইয়া দেওয়া।" প্রকৃত আর্য্যের লক্ষণ এই যে, কোন প্রাচীন ভাবকে বা প্রথাকে রক্ষা করিতে হইলে তাহা যুক্তিসম্মত বলিয়াই রক্ষা করিতে হইবে,

আর্য্যামি বলে—কেবল প্রাচীনতার দলিলের বলেই তাহা রক্ষণীয়। এইখানেই আসল প্রভেদটা। "আমার অভিপ্রায় এই যে, যদি আমরা আমাদের আপনাদের দেশের manners, customs রক্ষা করা শ্রেয় বোধ করি, তবে Reasonএর দোহাই দিয়াই সেই পথ অবলম্বন করিব—Antiquityর দোহাই দিয়া নয়।" এই পত্রখণ্ডও রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এবং তাঁহার বৃদ্ধ হিন্দুর আশার সমালোচনারূপে লিখিত।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে ভারতবোধ স্বতোজাগ্রত ছিল, সেকালের অনেকের মনে যেমন সাহেবিয়ানার বা আর্য্যামির ধাক্কায় জাগিয়াছিল—তেমন ভাবে জাগে নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভারতবোধ সম্পূর্ণ স্বকীয় ও স্বোপার্জ্জিত, তাহাকে স্বয়ম্ভূ বলা চলে। এই স্বাতন্ত্র্যের গুণেই তিনি তৎকালীন মনীষীসমাজে দ্বীপবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজমান। বাস্তবিক তাঁহাকে কোন দলে, কোন সমাজে, কোন বিশেষ ধারার অন্তর্গত করিয়া দেখিবার উপায় নাই। তৎসত্বেও সেকালের ভারতচৈতন্যরূপ সাধারণ ভাবের সূত্রে তিনি যুক্ত ছিলেন। দ্বীপখণ্ড যতই স্বতন্ত্র হোক না কেন—মহাসমুদ্রের তলে তলে তাহা কি মহাদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০ সালে। তিনি ১৯২৬ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে লোকান্তরিত হন। তাঁহার শেষজীবন শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, স্বপ্ন-প্রয়াণ তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাঙলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপককাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের শেষজীবন দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় এবং দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থরচনায় অতিবাহিত হয়। গীতাপাঠ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা। তাঁহার পদ্যের মতো গদ্যও একান্ত নিজস্ব। বাঙলাসাহিত্যের দুর্ভাগ্য এই যে, বাঙলাগদ্য ইংরাজিগদ্যের নকলে গড়িয়া উঠিয়াছে—লোকের মুখের কথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। এই অভাবসম্বন্ধে সচেতন হইবার পরে অনেকে মৌখিক ভাষার ছাঁচে গদ্য গড়িতে সপ্রয়াস হইয়াছেন বটে—কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য ধারার অর্থাৎ ইংরাজি নকলের গদ্য এমন সুদৃঢ় ভাবে শিকড় চালাইয়া দিয়াছে যে, মৌখিক ছাঁচের গদ্য আর সুবিধা করিতে পারে নাই—কোন কোন স্থানে তাহা ক্ষীণ ধারায় বহমান, আবার কোথাও কোথাও বা তাহা অজ্ঞাতসারে সাধু গদ্যের নকল করিতে গিয়া অধিকতর কৃত্রিম হইয়া বিরাজমান। দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য বঙ্কিমী গদ্যও নয়, আলালী গদ্যও নয়, মার্জ্জিতরুচির মনীষী ব্যক্তি লোক-মুখের ভাষায় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ গদ্য লিখিতে পারিতেন—দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য তাহার একটা খসড়া। খসড়া বলিবার উদ্দেশ্য, এই গদ্য-রীতিকে চূড়ান্ত অবধি লইয়া যাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। তাঁহার মানসিক শক্তি বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ায় কোন ধারাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বহুমুখিতা স্বল্প-প্রতিভাবান ব্যক্তির কালস্বরূপ। কাব্য, তত্ত্ববিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, বাঙলা শর্টহ্যাণ্ড বা রেখাক্ষর-প্রণালী-উদ্ভাবন, প্রথম স্বরলিপি-রচনা এবং কাগজের বাক্স, কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত ও

তাহার কৌশল বর্ণনা করিয়া Boxometry গ্রন্থ প্রণয়ন—এইসব পরস্পর ভিন্ন ও নানা শ্রেণীর কার্য্যে তিনি নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন—কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে আর পারেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যিক কৃতিত্বের দীনতার কারণ ব্যাখ্যাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে একটি গৃহিণীপণার ভাব থাকে। ঐ ভাবটির অভাবে অনেক শক্তিমান ব্যক্তি শক্তির অনুরূপ চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা বিশেষ সত্য। কিন্তু ইহাও বিশেষ সত্য যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিভাধর মনীষী ছিলেন। মনের বহুমুখিতা প্রতিভার অকৃত্রিম লক্ষণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

শান্ত সমাহিত গিরিশৃঙ্গ মাঝে মাঝে একখানি জগদ্দল পাথর খসাইয়া দেয়, বন, বনস্পতি দলিত করিতে করিতে সে পাথর ছুটিয়া নামে, তাহার পেষণে ঐরাবত আর্তনাদ করিয়া ওঠে, তাহার পতনে ধরা কম্পিত হয়। সমাধি-রসিক রামকৃষ্ণ তাঁহার ধ্যানের শিখর হইতে একখানি বিশাল পাথর খসাইয়া দিয়াছিলেন। সে-পাথর বহুযুগের সঞ্চিত বাধা ও আবর্জনা দলিত করিয়া ছুটিয়াছিল, ঐরাবতকে পিষ্ট করিয়াছিল, আর তাহার অবরোহণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সমগ্র জগতে নূতন চৈতন্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। যোগীশিখরভ্রষ্ট সেই প্রস্তরখণ্ডের নাম বিবেকানন্দ।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের মতো প্রচণ্ড বেগবান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু তাই বা বলি কেন? গান্ধী-অভ্যুদয়ের পূর্বে ব্যক্তিত্বের এমন সাধনবেগ আর ইদানীং কালে এদেশে দৃষ্ট হয় নাই। গত শতাব্দীর বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বও প্রবল ছিল—বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহারাই ছিলেন বাঙলাদেশের প্রবলতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু স্বামীজীর আত্মপ্রকাশের পরে লোকের সমস্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। বিবেকানন্দের প্রতিভার আধার তাঁহার ব্যক্তিত্বে। ভারতের বহুযুগসঞ্চিত সাধন-বেগেরই নাম যেন বিবেকানন্দ। ওই সাধন-বেগ শব্দদ্বয়ে তাঁহার স্বরূপের যেমন প্রকাশ, এমন আর কিছুতেই নয়। স্বামীজীর কর্মশক্তি, মনীষা দুই-ই প্রচুর ছিল—কিন্তু যে শক্তির বেগে এ সমস্ত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার নাম ব্যক্তিত্বের শক্তি। তাঁহার চরিত্রশক্তির এই ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হইলে তাঁহাকে যথার্থ শাক্ত বলিতে হইবে।

প্রত্যেক মানুষের মৌলিক বেগটা বিশেষ কেন্দ্র হইতে আসে, জীবনীকারের পক্ষে সেই মৌলিক বেগটার প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। রামমোহনের চরিত্রের এই মৌলিক বেগ ছিল, অগস্ত্য-তৃষ্ণার উপমাস্থল জ্ঞানার্জনের আগ্রহ,—স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। বিদ্যাসাগর দুর্জয় কর্মোদ্যমের ধাক্কায় চালিত ছিলেন। এমন কি, তাঁহার সাহিত্যও কর্মোদ্যমের অন্যতম বিকাশ। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের অভাব না দেখিলে তিনি এক কলমও লিখিতেন কি না সন্দেহ। বিধবাবিবাহবিষয়ক তাঁহার পুস্তিকাগুলি বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টারই লিপিময় রূপ। যে একখানি পুস্তক তিনি নিছক সাহিত্য-প্রেরণায় লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন, সেই আত্মচরিত তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। আত্মপ্রকাশের জন্য কর্মই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল—অন্য পন্থার আবশ্যক তিনি অনুভব করেন নাই। কেশবচন্দ্র স্বভাব-ধর্মে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণও বৈষ্ণব। তাঁহার শেষ সাধন-জীবন খোল-করতালে উদ্দাম। অনেকে ইহাকে একটা প্রচারমূলক পন্থা বা Pose মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নয়, তাঁহার

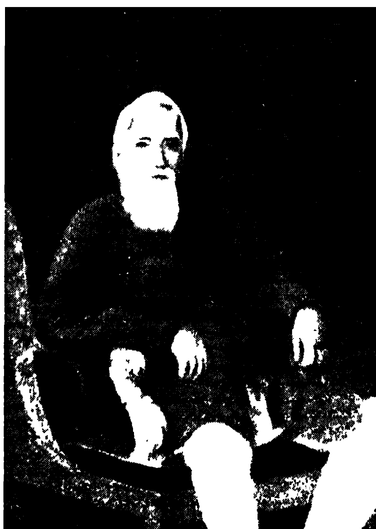


ভূদেব মুখোপাধ্যায়





প্যারি সরকার



রামতনু লাহিড়ী

অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছিল। এই কারণেই একদিন তাঁহাকে মহর্ষির আদিসমাজ ত্যাগ করিতে হইল, যেহেতু মহর্ষি অদ্বৈতবাদের নাম সহ্য করিতে না পারিলেও তাঁহার সমাজে খোল-করতালে উদ্দাম হইয়া উঠিবার অবকাশ ছিল না। স্বামীজীর চরিত্রের মৌলিক ধাক্কা ছিল "অচল-চলন শৈলদলন" সাধন-বেগের মধ্যে নিহিত। এই প্রত্যাশাতে তাঁহার মনীষা ও কর্ম্মস্পৃহা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তা-ই নয়, ঝরণার বেগে নুড়িগুলো যেমন চপল চঞ্চল হইয়া ছুটিতে থাকে, পরস্পরে আঘাত করিয়া সঙ্গীত তুলিতে থাকে, আবার আপাতঅরাজকতার মধ্যেও একটা নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়; স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের গোমুখী-নিঃসৃত ও সাধন-বেগ পরিচালিত বাঙলাভাষাও তেমনি অপূর্বশ্রুত সঙ্গীতে এবং ভঙ্গীতে ছুটিয়াছে। স্বামীজীর বাঙলা স্টাইল শুধু অপূর্ব নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটি বাহন। বাঙলা কথ্য স্টাইলের ইহাই যথার্থ আদর্শ। তাঁহার স্টাইলের তুলনায় হুতোম ও আলাল vulgar, আর পরবর্তীদের কথ্য স্টাইল সাধু ভাষার মতোই, সাধু ভাষার চেয়েও অনেক বেশি কৃত্রিম। ভারতের উচ্চবর্ণদের লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন—"আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা "ডম্মম্" বলে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি।··· তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম। অতীতের কঙ্কালচয়। এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

এইতো যথার্থ কথ্য স্টাইলের আদর্শ। কথ্য স্টাইল কথ্য হওয়া চাই। আমাদের সাহিত্যিকগণ কথ্য স্টাইলকে লিখিত অক্ষরে ধরিতে চান—বনের পাখী কি খাঁচায় পুরিলে আর তেমন করিয়া গান করে। সে তখন খাঁচার পাখী। শিক্ষিত খাঁচার পাখী যে কম সুন্দর এমন নয়, তাহার গানও কম মনোহর নয়, কিন্তু খাঁচার পাখীর ও বনের পাখীর জাত যে স্বতন্ত্র।

কেবল স্বামীজীর স্টাইল আলোচনার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত অংশ উদ্ধৃত হয় নাই—অন্য কারণ আছে এবং সেটাই আসল কারণ। যে-ভারত-আবিষ্কারের কাহিনী আমরা বলিতে বসিয়াছি, পূর্বোক্ত অংশে পাইলাম তাহার ভবিষ্যৎ মূর্তি—ভাবী ভারতের অধিবাসীদের স্বরূপ। কিন্তু তবু

ইহা কল্পনা মাত্র—স্বামীজীর সময়ে কল্পনার অধিক ছিল না। স্বামীজীর কল্পনা গান্ধীজীর কর্মে মূর্তিলাভ করিয়াছে—ভাবী ভারতের অধিবাসীর দল ধীরে ধীরে, একে একে, দলে দলে লাঙল ধরিয়া চাষার কুটীর ভেদ করিয়া, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। বাহির হইতেছে তাহারা মুদির দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ হইতে, হাট-বাজার-কারখানার ঘর হইতে। স্বামীজীর কল্পনা গান্ধীজীতে আসিয়া সত্য হইয়া উঠিতেছে। স্বামীজী ও গান্ধীজী একই প্রবাহের পূর্বাপর।

বাস্তবিক এদেশে সন্ন্যাসী না হইলে কেহ যথার্থ সম্মান পায় না, সন্ন্যাসীর ছাড়া আর কাহারো বাক্য এদেশের মর্মে পশে না। তার অর্থ এ নয় যে, সন্ন্যাসকেই একমাত্র কার্য্য বলিয়া ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে। এদেশের সন্ন্যাসীরাই বলিয়াছেন যে, সকলের সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন নাই, যে কেহ যে কোন আশ্রমে থাকিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। তবে তাঁহাদের উপদেশ এই যে, তুমি ধনার্জনই করো, আর জ্ঞানার্জনই করো, ব্যবসায়ই করো, আর বাণিজ্যই করো, তাহাকেই একমাত্র সত্য মনে করিও না, মহত্তর জীবনাদর্শের কথা সর্বদা স্মরণ রাখিও, গৃহত্যাগী হইবার উদ্দেশ্যে নয়, গৃহকে ভালো করিয়া ভোগ করিবারই উদ্দেশ্যে। ভারতের সন্ন্যাসীদের উপদেশ এই যে, ভোগের জন্যই সংযমের আবশ্যক, অর্জনের জন্যই ত্যাগের আবশ্যক। আর কেবলই ভোগ ও অর্জন ছাড়া যদি অন্য কিছু মনে না রাখো—তবে অর্জিত ধনও ভোগে লাগিবে না, ভোগ্যবস্তুও তোমার মুষ্টি এড়াইয়া পালাইবে। ইউরোপ অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তিতে ভোগ করিতে পারিতেছে কি? তাহার অঙ্গের রণ-ক্ষত যে শুকাইতেই সময় পাইতেছে না—ভোগ করিবে কি?

পূর্বোক্ত অংশে যেমন ভারতের ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের রূপ পাইলাম, তেমনি পাওয়া গেল ভারতবর্ষের স্বরূপ। কিন্তু সে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতের নয়—অতীতেরও নয়, আর বর্তমান কালের তো নয়ই—সে ভারতবর্ষ চিরন্তন। তাহারই দিব্যরূপে যুগে যুগে ভারতীয় মনীষী ও কর্মীদের, কবি ও যোগীদের মন ভুলিয়াছে—প্রাণ ভুলিয়াছে, হৃদয় বিমোহিত হইয়াছে, শরবৎ ঋজুগতিতে তাহারা সেই অতীন্দ্রিয় লক্ষ্যের প্রতি চিরকাল ধাবিত হইয়াছে। উমার প্রেমদৃষ্টির কাছে ভিখারীর ছদ্মবেশ অবলুপ্ত হইয়া মহাদেবের দিব্য-সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছিল, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চক্ষেও তেমনি এদেশের আপাতদীনতা বাধা হয় নাই, ইতিহাসের বিচিত্র ছক-কাটা ছিন্ন উত্তরীয়ের অন্তরালে সনাতন ভারতবর্ষকে দর্শন করিয়া তাঁহারা মানবজন্মের সার্থকতা অনুভব করিয়াছেন। ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া চিরপরিব্রাজক বিবেকানন্দ বলিতেছেন—"হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না, তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন

কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিদধিক আশী বৎসরের জীবন দুই শতাব্দীর মধ্যে সমভাবে ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা প্রথম হইতেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও তাঁহার মনীষা জীবনের উত্তর-পূর্বের পূর্বে দেশকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহার যৌবনকালে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং প্রৌঢ় বয়সে বিবেকানন্দের প্রভাব দেশকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স তেত্রিশ বৎসর। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও অনুশীলনতত্ত্ব প্রকাশের সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিতে সুরু করিয়াছে। তার পরে আসিল বিবেকানন্দের যুগ। শিকাগো বক্তৃতার সময় হইতেই বিবেকানন্দের মনীষা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিবেকানন্দের উদ্দীপনাই স্বদেশীযুগের প্রধান সহায় ছিল। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের পরে রবীন্দ্রনাথের বাণী জনসমক্ষে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা সাময়িক মাত্র, সময়ের স্রোতে তাহার অবসান হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পরে প্রথমবারের জন্য সাধারণের দৃষ্টি কবির প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তখন তাঁহার বাণী প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ ঘটিল। কিন্তু এই ঘটনার অত্যল্পকাল মধ্যেই গান্ধীজীর আবির্ভাব। সেই হইতে গান্ধী-চন্দ্রমাই জনসমুদ্রের প্রধান আকর্ষণ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ ভাবপ্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—এমন সময়ে প্রত্যক্ষতর গান্ধীপ্রভাব আসিয়া পড়িল—কাজেই রবীন্দ্রপ্রভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইল না। রবীন্দ্রনাথের মনীষা বা দিগ্‌দর্শন যে ইঁহাদের কাহারো চেয়ে কম এমন নয়, কিন্তু কবির প্রভাব বিস্তারিত হইতে কিছু অধিক সময় নেয়—তেমনি আবার একবার বিস্তারিত হইয়া গেলে সহজে লোপ পায় না।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত মহাকবি গ্যয়টের জীবনস্বারূপ্যের ঐক্য সম্বন্ধে আমি একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি—আর একবার করিতে দোষ নাই। নানা অনিবার্য্য কারণে বিলম্বিত রবীন্দ্রপ্রভাবের সহিত গ্যয়টের প্রভাব বিস্তারের বাধার মিল আছে। গ্যয়টের জন্ম ১৭৪৯ সালে, তরুণ বয়স হইতেই তিনি কবি ও নাট্যকাররূপে সর্বজনের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তৎসত্বেও তাঁহার বাণী নেপোলিয়ান-সমরাগ্নি নির্বাপিত হইবার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতকের উপান্ত দশক অবধি ভল্‌টেয়ারের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ও নেতিবাদী জীবনদর্শন ইউরোপকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তার পরে আসিল ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের উগ্র জতীয়তাবাদ, নকল সিংহনাদ এবং ভিত্তিহীন আন্তর্জাতিকতা গ্যয়টের বাণীর প্রতিকূল। ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্য্য পরিণাম নেপোলিয়ান ও ইউরোপব্যাপী ওলটপালট। সে তূরীনাদের মধ্যে গ্যয়টের আত্মোপলব্ধির আহ্বান, দেশকাল

নিরপেক্ষ মানুষকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা কাহার কানে পশিবে? যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের কাছে গ্যয়টের কালচার বা সংস্কৃতিবাদকে একপ্রকার বিলাসিতা বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তখনকার অধিকাংশ লোকেই তাঁহাকে দ্বিরদরদস্তম্ভাশ্রয়ী স্বার্থপর বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিত। নেপোলিয়ানের শৃঙ্খল হইতে প্রুশিয়ার আত্মমোচনের পর্বটাতে গ্যয়টের প্রতি লোকের বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। ঐ সময়টাতেই সর্বজন ও সর্বজনীন কবির মধ্যে ভুলবোঝা চরমে উঠিয়াছিল। জাতির আত্মমুক্তির যুদ্ধের সময়ে জাতির শ্রেষ্ঠ কবির আন্তর্জাতিক দর্শনকে লোকে সহ্য করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-ঘটনার সঙ্গে কি ইহার মিল পাওয়া যায় না? অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কি এদেশের লোকে তাঁহাকে পলাতক আখ্যা দেয় নাই? রুশ মনীষীদের অভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলে কি লোকে তাঁহার আন্তর্জাতিক মনোভাবকে বিলাসিতা বলে নাই? এসব দূরকালের কথা নয়, মনে না থাকাই বিচিত্র!

নেপোলিয়নের যুদ্ধবিবাদ মিটিয়া গেলে, ইউরোপ যখন শান্ত হইল, প্রুশিয়া যখন পুনরায় স্বাধীন হইল, তখনই গ্যয়টের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল, নিতান্ত অসহায়ভাবেই পড়িল। দেশব্যাপী অশান্তি ও অভাবের মধ্যে কোথাও যখন কোন আশ্রয় নাই, তখন আর্ত মানবকুল আত্মোপলব্ধির ঋষিকে অটল স্ফটিকস্তম্ভ মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। তাহারা বুঝিল স্বাধীনতাই চরম অবস্থা নয়, আত্মোপলব্ধির সহায়ক বলিয়াই স্বাধীনতার এত মূল্য! তখন হইতেই গ্যয়টের প্রভাব প্রসারিত হইতে লাগিল। মহাকবির বাণী অমূল্য বলিয়াই তাহা কালোত্তর, আর কালোত্তর বলিয়াই ভরসা করিয়া লোকে তাহাকে মনের ওয়েটিং রুমে বসাইয়া রাখে—সাময়িক প্রয়োজন সাধনে তাহার বড় ত্বরা। সময় বিশেষে পরব্রহ্মের চেয়ে একটি পাতিলেবুর মূল্য অধিক।

আমাদের দেশে এতদিনে রবীন্দ্রপ্রভাব বিস্তৃতির সম্যক অনুকূল অবস্থা আসিয়াছে। দেশ স্বাধীন করিবার জরুরী কাজটা মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু লোকে এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, স্বাধীনতাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথমাত্র। এখনো আমরা নবলব্ধ স্বাধীনতাকে ছোট ছেলের নূতন জুতার মতো সযত্নে মুছিয়া হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, অপর বাড়ির ছেলেটিকে দেখাইয়া তাহাকে অবাক্ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এখনো আমরা তাহাকে পায়ে দিয়া যাত্রাআরম্ভ করিবার উদ্যোগ দেখাইতেছি না। কিন্তু একদিন তো করিতেই হইবে, পায়ের জুতা চিরদিন হাতে রাখা চলিবে না। যখন বুঝিব যে, স্বাধীনতা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, মহত্তর উদ্দেশ্য গঠনের বাহনমাত্র—তখন! যখন বুঝিব স্বাধীনতা মানবতার বাহন মাত্র—তখন! তখনই মহাকবির সন্ধান পড়িয়া যাইবে। মহাকবির এবং মহাযোগীর! রবীন্দ্রনাথের এবং গান্ধীর! সত্য কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রকৃষ্টতম বাণীকে আমরা অদ্যাবধি-গ্রহণ করি নাই। গান্ধী আমাদের কাছে ইংরাজ তাড়ানোর সেনাপতি এবং ধর্মঘট বাধাইবার উপলক্ষ্য! রবীন্দ্রনাথ আমাদের অলস অবসরবিনোদনের সঙ্গীতস্রষ্টা এবং

সোজা কথাকে বাঁকাইয়া বলিবার অজুহাত! হায়রে! সুধাপাত্রের কারুকার্য্য দেখিয়াই আমরা নাচিয়া মরিলাম, ভিতরের বস্তু দেখিবার উদ্যম আর হইল কই? বিধাতা হাসিতেছেন! কিন্তু এমন চিরদিন থাকিবে না—দেশের সুস্থ অবস্থায় জীবনসাধনার আহ্বান আসিবামাত্র সেই যুগল সাধকের সাধনার সুরু হইবে, লোকে তখন আধার ছাড়িয়া আধেয়ের সংবাদ লইবে। তখন লোকচিত্তে রবীন্দ্র-বাণী-জিজ্ঞাসা জাগিবে। সে বাণী কি?

রবীন্দ্রনাথের বাণী ভারতবর্ষের বাণী। ভারতবর্ষের বাণী কি? ইতিহাসাতীত দুর্গম যুগ হইতে এই সুবৃহৎ দেশের মনীষী ও কর্মনায়কগণ এই ভূখণ্ডকে একটি অবিভাজ্য প্রাণময় অংশরূপে দেখিয়া আসিতেছেন—আর এই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজকে, বিচিত্র ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী জনগণকে একটি জটিল অথচ একজনসমুদ্ররূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই লক্ষ্যে পৌছিবার আশায় এদেশের মনীষীগণ সমন্বয়বাদের সাহায্য লইয়াছেন। এদেশের দর্শনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা যেমন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা, বহির্জগতে অর্থাৎ সমাজে ও রাষ্ট্রেও তেমনি একটি সমন্বয়ের প্রয়াস এখানে লক্ষিত হয়। এ দুই-ই একই প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ মাত্র, একই সাধনপন্থার বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী গতি। পাশ্চাত্য সভ্যতা unity বা ঐক্যের চেয়ে মহত্তর কোন সিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে পারে না। রোম তাহার সাম্রাজ্যাধীন বিভিন্ন জাতিকে এক করিতে অর্থাৎ 'রোমান' করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—এই অসম্ভব প্রয়াসের প্রচণ্ড উদ্যমে প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হইয়া রোমসাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল। এই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত অন্যত্র মিলিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অশ্বেত ভূখণ্ডে পৌছিয়া বুঝিতে পারিল যে তথাকার আদিম জাতিগুলিকে এক করিয়া লওয়া সম্ভব নয়, তাই তাহাদের মারিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা সেখানে একমাত্র হইয়া বজায় থাকিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা গায়ের জোরে পিটিয়া এক করা কিম্বা উৎখাত করিয়া ফেলিয়া এক থাকা ইহার অধিক অন্য কোন পন্থা এখনো উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। এখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার মৌলিক দুর্বলতা।

ভারতবর্ষের মনীষিগণ এই সমস্যার সুষ্ঠুতম সমাধান করিয়াছিলেন। উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে একের বহু হইবার লীলার ফলে এই জগতের সৃষ্টি। অর্থাৎ জগতে 'এক' ও 'বহু' দুই-ই আছে, কোনটাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—ইহা এক অটলতম Realism! কাণ্ডজ্ঞান বলে বহু আছে, তত্ত্বজ্ঞান বলে এক আছে, দুইজনেই বাস্তববাদী, দুইজনেই সত্য কথা বলে। Realist ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো কেবল 'একে' স্বীকার করিয়া সংসারে ঐক্য স্থাপন করিতে উদ্যত হয় নাই; তত্ত্বজিজ্ঞাসাহীন বর্বরদের মতো নিজেকে বহুর অরণ্যেও হারাইয়া ফেলে নাই। ভারতবর্ষ কাণ্ডজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, Realism ও Super-Realism-এর সাহায্যে এই দুইকেই মানিয়া লইয়া একটা জীবনবাদ উদ্ভাবন করিয়াছে—ইহাকেই বলি সমন্বয়বাদ। এদেশের ভূগোল ও ইতিহাসকে জুড়িয়া দিয়া একটা স্থূল উদাহরণ লওয়া যাক। ভূগোল বলে এই ভারত ভূখণ্ড পৃথিবীর অন্য ভূখণ্ড হইতে সমুদ্র ও গিরিমালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন

হইয়া স্বতন্ত্র; ভৌগোলিক বিচারে ইহা অবিভাজ্য—অর্থাৎ ইহা 'এক'। আবার ইহার ইতিহাস বলে যে এখানে বহু বিভিন্ন স্বার্থ, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা আছে, উচ্চাবচ বহু স্তরের সভ্যতা একই সময়ে পাশাপাশি বর্তমান আছে—অর্থাৎ ইহা 'বহু'। তবেই দেখা যাইতেছে ভূগোলের সাম্য ও ইতিহাসের সাম্য ভিন্ন ও স্বতোবিরোধী, অর্থাৎ এক ও বহু। এখন, এই দুই পরস্পরপরিপন্থী তথ্যকে একটি কাঠামের মধ্যে আঁটিয়া একটি জীবনাদর্শ সৃষ্টির প্রয়াসই ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক সাধনবেগ। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন এক ও বহু দুই-ই সত্য ও স্বীকার্য্য, দেশের ক্ষেত্রেও তেমনি ভূগোলের একত্ব ও ইতিহাসের বহুত্ব—দুইকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতীয় মনীষিগণ দেশের অবিভাজ্য ঐক্যকে অটুট স্বীকার করিয়া লইয়া ধর্ম, সম্প্রদায় ও স্বার্থের বৈচিত্র্যকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিকশিত হইবার অধিকার দিলেন। যাত্রার আসরে দর্শকে ঠেসাঠেসি করিয়া বসিয়াছে, কাহারো নড়িবার উপায় নাই। কিন্তু মাঝখানে খানিকটা জায়গা খালি—সেখানে নাচ হইবে। সেখানে নর্তকের অবাধ গতির অধিকার। বিশ্বব্যাপারও কি এমনি একটা যাত্রার আসর নয়? সমস্তই এখানে অমোঘ নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা, কাহারো স্বৈরাচারের উপায় নাই, কিন্তু তেমনি আবার প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে খানিকটা জায়গা খালি—সেখানে নাচ হইবে। সেখানে ভক্ত ও ভগবানের লীলার আসর। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপারের বৃহৎ ব্যাপারে মানুষ নিয়মাধীন, ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে তার অবাধ স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের সভ্যতাও এমনি একটি যাত্রার আসর, ভূগোলের ক্ষেত্রে সে নিয়মাধীন, ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা আছে। এদেশকে এক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, যে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায় তাহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করিতে পারে, ভারতবর্ষ কখনো তাহাতে আপত্তি করে নাই, বরঞ্চ সেই পথেই উৎসাহ দিয়াছে। যেমন হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের কোন সংজ্ঞা নাই। যে-কেহ নিজেকে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিয়া তারপরে নিজের খুশী ও বিশ্বাস মতো চলিতে পারে—তাহাতে বাধা নাই, আর সেই জন্যই হিন্দু-সমাজে এত অসংখ্য সাধনপন্থার সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। আরও একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে—বৃটিশ কমনওয়েলথ্। এই বস্তুরও বোধ করি কোন সংজ্ঞা সম্ভবে না। কেবল নিজেকে কমনওয়েলথ্ভুক্ত বলিলেই চলে। আয়ার্লাণ্ড কমনওয়েলথ্ভুক্ত হইয়াও গত যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। আবার গত যুদ্ধের সময়ে পরাজিতপ্রায় ফ্রান্সকে রাতারাতি কমনওয়েলথ্ভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ফ্রান্স নিজে আপত্তি না করিলে ইহা সম্ভব হইত, এবং কেবল বৃটিশ কমনওয়েলথ্-এর ক্ষেত্রেই সম্ভব হইত। বৃটেন ভারতে দুইশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে—এই দুই শত বৎসরের মধ্যেই তাহার কমনওয়েলথের আইডিয়ার বিশেষ বিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ যে তাহাকে ইঙ্গিত দেয় নাই—একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক জীবনাদর্শের নিকটতম প্রতিবেশী বৃটিশ কমনওয়েলথ্। নিকটতম কিন্তু খুব নিকটবর্তী নহে—মাঝখানে দূরত্ব অনেক। বৃটিশ কমনওয়েলথ্-এর দুর্বলতা এই যে ইহাতে কেবল শ্বেত জাতিরই স্বাভাবিক স্থান আছে। আজ আয়ার্লাণ্ড কমনওয়েলথ্-এর বাহিরে যাইতে

পারে, কিন্তু কাল মার্কিনরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইলে কাহারো মনে চমক লাগিবে না।

পরকে আপন করিবার প্রতিভা ভারতবর্ষের বিশেষ প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। এই প্রতিভা তাহার ইতিহাসের ভিতর দিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্রিয়মান। এদেশের মনীষী, চিন্তানায়ক ও কর্মীপুরুষগণ এই প্রতিভার অনুকূলেই কাজ করিয়া আসিতেছেন। বুদ্ধ হইতে গান্ধী, অশোক হইতে আকবর, হর্ষ হইতে নেহেরু, বেদব্যাস হইতে রবীন্দ্রনাথ—সকলেই এই ভারতীয় প্রতিভার ধারক, বাহক ও গায়ক। কেবল ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের কল্পনা করিয়াছে, নিছক হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় তাহারা অবান্তর ও অভারতীয়।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য ভারতীয় ইতিহাসের অমর বাণীরূপ। মহাভারতের পরে এমন সার্থক, এমন বিরাট, এমন বাণীরূপ আর কল্পিত বা লিখিত হয় নাই। রবীন্দ্রসাহিত্য এ যুগের নূতন মহাভারত।